বিচিত্র গল্প।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

কলিকাতা;

১৩/৭নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে

শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ও

৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন হইতে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩০১।

সূচী

বিচিত্র গল্প।

দ্বিতীয় ভাগ।

দালিয়া।

ভূমিকা।

পরাজিত শা সুজা ঔরঙ্গজীবের ভয়ে পলায়ন করিয়া আরাকান রাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সঙ্গে তিন সুন্দরী কন্যা ছিল। আরাকান রাজের ইচ্ছা হয় যুবরাজদের সহিত তাহাদের বিবাহ দেন। সেই প্রস্তাবে শা সুজা নিতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করাতে একদিন রাজার আদেশে তাঁহাকে ছলক্রমে নৌকা-যোগে নদীমধ্যে লইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। সেই বিপদের সময়ে কনিষ্ঠা বালিকা আমিনাকে তিনি স্বয়ং নদীমধ্যে নিক্ষেপ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা আত্মহত্যা করিয়া মরে। এবং সুজার একটি বিশ্বাসী কর্ম্মচারী রহমৎ আলি জুলিথাকে লইয়া সাঁতার দিয়া পালায় এবং সুজা যুদ্ধ করিতে করিতে মরেন।

আমিনা খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়া দৈবক্রমে অনতি-বিলম্বে এক ধীবরের জালে উদ্ধৃত হয় এবং তাহারি গৃহে পালিত হইয়া বড় হইয়া উঠে।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইয়াছে, এবং যুবরাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদিন সকালে বৃদ্ধ ধীবর আসিয়া আমিনাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল "তিন্নি!" ধীবর আরাকান ভাষায় আমিনার নূতন নামকরণ করিয়াছিল। "তিন্নি, আজ সকালে তোর হৈল কি! কাজকর্ম্মে যে একেবারে হাত লাগাস্ নাই! আমার নতুন জালে আঠা দেওয়া হয় নাই, আমার নৌকো"—

আমিনা ধীবরের কাছে আসিয়া আদর করিয়া কহিল "বুঢ়া, আজ আমার দিদি আসিয়াছেন, তাই আজ ছুটি!"

"তোর আবার দিদি কে রে তিন্নি!"

জুলিখা কোথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল "আমি।"

বৃদ্ধ অবাক্ হইয়া গেল। তার পর জুলিখার অনেক কাছে আসিয়া ভাল করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল।

খপ্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুই কাজ কাম্ কিছু জানিস্?"

আমিনা কহিল "বুঢ়া, দিদির হইয়া আমি কাজ করিয়া দিব। দিদি কাজ করিতে পারিবে না।"

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুই থাকিবি কোথায় ?"

জুলিখা বলিল "আমিনার কাছে।"

বৃদ্ধ ভাবিল এওত বিষম বিপদ! জিজ্ঞাসা করিল "খাইবি কি ?"

জুলিখা বলিল "তাহার উপায় আছে" বলিয়া অবজ্ঞাভরে ধীবরের সম্মুখে একটা স্বর্ণমুদ্রা ফেলিয়া দিল।

আমিনা সেটা কুড়াইয়া ধীবরের হাতে তুলিয়া দিয়া চুপি-চুপি কহিল "বুঢ়া, আর কোন কথা কহিস্ না, তুই কাজে যা। বেলা হইয়াছে।"

জুলিখা ছদ্মবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আমিনার সন্ধান পাইয়া কি করিয়া ধীবরের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সে সমস্ত কথা বলিতে গেলে দ্বিতীয় আর একটি কাহিনী হইয়া পড়ে। তাহার রক্ষাকর্ত্তা রহমৎ শেখ ছদ্মনামে আরাকান রাজসভায় কাজ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ছোট নদীটি বহিয়া যাইতেছিল এবং প্রথম গ্রীষ্মের শীতল প্রভাত বায়ুতে কৈলু গাছের রক্তবর্ণ পুষ্পমঞ্জরী হইতে ফুল ঝরিয়া পড়িতেছিল।

গাছের তলায় বসিয়া জুলিখা আমিনাকে কহিল "ঈশ্বর যে আমাদের দুই ভগ্নীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন সে কেবল পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য। নহিলে, আর ত কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না।"

আমিনা নদীর পরপারে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী সর্ব্বাপেক্ষা ছায়াময় বনশ্রেণীর দিকে দৃষ্টি মেলিয়া ধীরে ধীরে কহিল "দিদি, আর ওসব কথা বলিস্‌নে ভাই। আমার এই পৃথিবীটা একরকম বেশ লাগিতেছে। মরিতে চায় ত পুরুষগুলো কাটাকাটি করিয়া মরুক্‌গে, আমার এখানে কোন দুঃখ নাই।"

জুলিখা বলিল "ছি ছি আমিনা, তুই কি সাহজাদার ঘরের মেয়ে! কোথায় দিল্লির সিংহাসন, আর কোথায় আরাকানের ধীবরের কুটীর!"

আমিনা হাসিয়া কহিল "দিদি, দিল্লির সিংহাসনের চেয়ে আমার বুঢ়ার এই কুটীর এবং এই কৈলু গাছের ছায়া যদি কোন বালিকার বেশি ভাল লাগে তাহাতে দিল্লির সিংহাসন একবিন্দু অশ্রুপাত করিবে না।"

জুলিখা কতকটা আনমনে কতকটা আমিনাকে কহিল "তা তোকে দোষ দেওয়া যায় না, তুই তখন নিতান্ত ছোট ছিলি। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ্ পিতা তোকে সব চেয়ে বেশি ভাল বাসিতেন বলিয়া তোকেই স্বহস্তে জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সেই পিতৃদত্ত মৃত্যুর চেয়ে এই জীবনকে বেশি প্রিয় জ্ঞান করিস্ না। তবে যদি প্রতিশোধ তুলিতে পারিস্ তবেই জীবনের অর্থ থাকে।"

আমিনা চুপ করিয়া দূরে চাহিয়া রহিল। কিন্তু বেশ বুঝা গেল সকল কথা সত্ত্বেও বাহিরের এই বাতাস এবং গাছের ছায়া, এবং আপনার নবযৌবন এবং কি একটা সুখস্মৃতি তাহাকে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "দিদি, তুমি একটু অপেক্ষা কর ভাই। আমার ঘরের কাজ বাকি আছে। আমি না রাঁধিয়া দিলে বুঢ়া খাইতে পাইবে না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জুলিখা আমিনার অবস্থা চিন্তা করিয়া ভারি বিমর্ষ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় হঠাৎ ধুপ্ করিয়া একটা লম্ফের শব্দ হইল, এবং পশ্চাৎ হইতে কে একজন জুলিখার চোখ টিপিয়া ধরিল।

জুলিখা ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল "কেও!"

স্বর শুনিয়া যুবক চোখ ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, জুলিখার মুখের দিকে চাহিয়া অম্লানবদনে কহিল "তুমি ত তিন্নি নও।" যেন জুলিখা বরাবর আপনাকে তিন্নি বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কেবল যুবকের অসামান্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির কাছে সমস্ত চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

জুলিখা বসন সম্বরণ করিয়া দৃপ্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই চক্ষে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি!"

যুবক কহিল "তুমি আমাকে চেন না। তিন্নি জানে। তিন্নি কোথায়!"

তিন্নি গোলযোগ শুনিয়া বাহির হইয়া আসিল। জুলিখার রোষ এবং যুবকের হতবুদ্ধি বিস্মিতমুখ দেখিয়া আমিনা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কহিল "দিদি ওর কথা তুমি কিছু মনে করিয়ো না। ওকি মানুষ! ও একটা বনের মৃগ। যদি কিছু বেয়াদবী করিয়া থাকে, আমি উহাকে শাসন করিয়া দিব। দালিয়া, তুমি কি করিয়াছিলে!"

যুবক তৎক্ষণাৎ কহিল "চোখ টিপিয়া ধরিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম তিন্নি। কিন্তু ও ত তিন্নি নয়।"

তিন্নি সহসা দুঃসহ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া উঠিয়া কহিল "ফের! ছোট মুখে বড় কথা! কবে তুমি তিন্নির চোখ টিপিয়াছ? তোমার ত সাহস কম নয়!"

যুবক কহিল “চোখ টিপিতে ত খুব বেশি সাহসের আবশ্যক করে না। বিশেষতঃ পূর্ব্বের অভ্যাস থাকিলে। কিন্তু সত্য বলিতেছি তিন্নি, আজ একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম।”

বলিয়া গোপনে জুলিখার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমিনার মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

আমিনা কহিল “না, তুমি অতি বর্ব্বর! সাহাজাদীর সম্মুখে দাঁড়াইবার যোগ্য নও। তোমাকে সহবৎ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। দেখ, এম্‌নি করিয়া সেলাম কর।”

বলিয়া আমিনা তাহার যৌবনমঞ্জরিত তনুলতা অতি মধুর ভঙ্গীতে নত করিয়া জুলিখাকে সেলাম করিল। যুবক বহুকষ্টে তাহার নিতান্ত অসম্পূর্ণ অনুকরণ করিল।

বলিল “এমন করিয়া তিন পা পিছু হঠিয়া আইস।” যুবক পিছু হঠিয়া আসিল।

“আবার সেলাম কর।” আবার সেলাম করিল।

এমনি করিয়া পিছু হঠাইয়া সেলাম করাইয়া আমিনা যুবককে কুটীরের দ্বারের কাছে লইয়া গেল।

কহিল “ঘরে প্রবেশ কর।” যুবক ঘরে প্রবেশ করিল।

আমিনা বাহির হইতে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল “একটু ঘরের কাজ কর। আগুণটা জাগাইয়া রাখ।” বলিয়া দিদির পাশে আসিয়া বসিল।

কহিল “দিদি, রাগ করিস্‌নে ভাই, এখানকার মানুষগুলা এই রকমের। হাড় জ্বালাতন হইয়া গেছে।”

কিন্তু আমিনার মুখে কিম্বা ব্যবহারে তাহার লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় না। বরং অনেক বিষয়ে এখানকার মানুষের প্রতি তাহার কিছু অন্যায় পক্ষপাত দেখা যায়।

জুলিখা যথাসাধ্য রাগ প্রকাশ করিয়া কহিল "বাস্তবিক, আমিনা তোর ব্যবহারে আমি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি। একজন বাহিরের যুবক আসিয়া তোকে স্পর্শ করিতে পারে এত বড় তাহার সাহস!"

আমিনা দিদির সহিত যোগ দিয়া কহিল "দেখ্‌দেখি বোন্! যদি কোন বাদশাহ কিম্বা নবাবের ছেলে এমন ব্যবহার করিত তবে তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিতাম।"

জুলিখার ভিতরের হাসি আর বাধা মানিল না—হাসিয়া উঠিয়া কহিল "সত্য করিয়া বল্ দেখি আমিনা তুই যে বলিতেছিলি পৃথিবীটা তোর বড় ভাল লাগিতেছে, সে কি ঐ বর্ব্বর যুবকটার জন্য?"

আমিনা কহিল "তা সত্য কথা বলি দিদি, ও আমার অনেক উপকার করে। ফুলটা ফলটা পাড়িয়া দেয়, শীকার করিয়া আনে, একটা কিছু কাজ করিতে ডাকিলে ছুটিয়া আসে। অনেকবার মনে করি, উহাকে শাসন করিব। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। যদি খুব চোখ রাঙাইয়া বলি, দালিয়া, তোমার প্রতি আমি ভারি অসন্তুষ্ট হইয়াছি—দালিয়া মুখের দিকে চাহিয়া পরম কৌতুকে নিঃশব্দে হাসিতে থাকে। এদের দেশে পরিহাস বোধ করি এই রকম; দু'ঘা মারিলে

ভারি খুসি হইয়া উঠে তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ঐ দেখ না, ঘরে পূরিয়া রাখিয়াছি বড় আনন্দে আছে, দ্বার খুলিলেই দেখিতে পাইব, মুখ চক্ষু লাল করিয়া মনের সুখে আগুনে ফুঁ দিতেছে। ইহাকে লইয়া কি করি বল ত বোন! আমি ত আর পারিয়া উঠি না।”

জুলিখা কহিল “আমি চেষ্টা দেখিতে পারি।”

আমিনা হাসিয়া মিনতি করিয়া বলিল “তোর দুটি পায়ে পড়ি বোন্! ওকে আর তুই কিছু বলিস্ না।”

এমন করিয়া বলিল যেন ঐ যুবকটি আমিনার একটি বড় সাধের পোষা হরিণ, এখনো তাহার বন্য স্বভাব দূর হয় নাই—পাছে অন্য কোন মানুষ দেখিলে ভয় পাইয়া নিরুদ্দেশ হয় এমন আশঙ্কা আছে।

এমন সময় ধীবর আসিয়া কহিল “আজ দালিয়া আসে নাই তিন্নি?”

“আসিয়াছে।”

“কোথায় গেল?”

“সে বড় উপদ্রব করিতেছিল তাই তাহাকে ঐ ঘরে পূরিয়া রাখিয়াছি।”

বৃদ্ধ কিছু চিন্তান্বিত হইয়া কহিল “যদি বিরক্ত করে সহিয়া থাকিস্। অল্প বয়সে অমন সকলেই দুরন্ত হইয়া থাকে। বেশি শাসন করিস্ না। দালিয়া কাল এক থলু দিয়া আমার কাছে তিনটি মাছ লইয়াছিল।” (থলু অর্থে স্বর্ণ মুদ্রা।)

আমিনা কহিল “ভাবনা নাই বুঢ়া, আজ আমি তাহার কাছে দুই থলু আদায় করিয়া দিব, একটিও মাছ দিতে হইবে না।”

বৃদ্ধ তাহার পালিত কন্যার এত অল্প বয়সে এমন চাতুরী এবং বিষয়বুদ্ধি দেখিয়া পরম প্রীত হইয়া তাহার মাথায় সস্নেহ হাত বুলাইয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আশ্চর্য্য এই, দালিয়ার আসা যাওয়া সম্বন্ধে জুলিখার ক্রমে আর আপত্তি রহিল না। ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে আশ্চর্য্য নাই।

কারণ, নদীর যেমন এক দিকে স্রোত এবং আর এক দিকে কূল, রমণীর সেইরূপ হৃদয়াবেগ এবং লোকলজ্জা। কিন্তু সভ্যসমাজের বাহিরে আরাকানের প্রান্তে এখানে লোক কোথায়!

এখানে কেবল ঋতুপর্য্যায়ে তরু মঞ্জরিত হইতেছে, এবং সম্মুখের নীলা নদী বর্ষায় স্ফীত, শরতে স্বচ্ছ এবং গ্রীষ্মে ক্ষীণ হইতেছে; পাখীর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে সমালোচনার লেশমাত্র নাই, এবং দক্ষিণ বায়ু মাঝে মাঝে পরপারের গ্রাম হইতে মানব-চক্রের গুঞ্জনধ্বনি বহিয়া আনে কিন্তু কানাকানি আনে না।

পতিত অট্টালিকার উপরে ক্রমে যেমন অরণ্য জন্মে,

এখানে কিছুদিন থাকিলে সেইরূপ প্রকৃতির গোপন আক্র-মণে লৌকিকতার মানবনির্ম্মিত দৃঢ় ভিত্তি ক্রমে অলক্ষিত-ভাবে ভাঙ্গিয়া যায় এবং চতুর্দ্দিকে প্রাকৃতিক জগতের সহিত সমস্ত একাকার হইয়া আসে। দুটি সমযোগ্য নরনারীর মিলনদৃশ্য দেখিতে রমণীর যেমন সুন্দর লাগে এমন আর কিছু নয়। এত রহস্য, এত সুখ, এত অতলস্পর্শ কৌতূহলের বিষয় তাহার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব এই বর্ব্বর কুটীরের মধ্যে নির্জ্জন দারিদ্র্যের ছায়ায় যখন জুলিখার কুলগর্ব্ব এবং লোকমর্য্যাদার ভাব আপনিই শিথিল হইয়া আসিল তখন পুষ্পিত কৈলুতরুচ্ছায়ে আমিনা এবং দালিয়ার মিলনের এই এক মনোহর খেলা দেখিতে তাহার বড় আনন্দ হইত।

বোধ করি তাহারও তরুণ হৃদয়ের একটা অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত এবং তাহাকে সুখে দুঃখে চঞ্চল করিয়া তুলিত। অবশেষে এমন হইল কোন দিন যুবকের আসিতে বিলম্ব হইলে আমিনা যেমন উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত, জুলিখাও তেমনি আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিত এবং উভয়ে একত্র হইলে, চিত্রকর নিজের সদ্য-সমাপ্ত ছবি ঈষৎ দূর হইতে যেমন করিয়া দেখে, তেমনি করিয়া সস্নেহে সহাস্যে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত। কোন কোন দিন মৌখিক ঝগড়াও করিত, ছল করিয়া ভর্ৎসনা করিত, আমিনাকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া যুবকের মিলনাবেগ প্রতিহত করিত।

সম্রাট এবং আরণ্যের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। উভয়ে স্বাধীন, উভয়েই স্বরাজ্যের একাধিপতি, উভয়কেই কাহারো নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় না। উভয়ের মধ্যেই প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক বৃহত্ত্ব এবং সরলতা আছে। যাহারা মাঝারি, যাহারা দিনরাত্রি লোকশাস্ত্রের অক্ষর মিলাইয়া জীবন যাপন করে তাহারাই কিছু স্বতন্ত্র গোচের হয়। তাহারাই বড়র কাছে দাস, ছোটর কাছে প্রভু, এবং অস্থানে নিতান্ত কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়ায়। বর্ব্বর দালিয়া প্রকৃতি-সাম্রাজ্ঞীর উচ্ছৃঙ্খল ছেলে, শাহজাদীর কাছে কোন সঙ্কোচ ছিল না, এবং শাহজাদীরাও তাহাকে সমকক্ষ লোক বলিয়া চিনিতে পারিত। সহাস্য, সরল, কৌতুকপ্রিয়, সকল অবস্থাতেই নির্ভীক, অসঙ্কুচিত, তাহার চরিত্রে দারিদ্র্যের কোন লক্ষণই ছিল না।

কিন্তু এই সকল খেলার মধ্যে এক একবার জুলিখার হৃদয়টা হায় হায় করিয়া উঠিত, ভাবিত সম্রাটপুত্রীর জীবনের এই কি পরিণাম!

একদিন প্রাতে দালিয়া আসিবামাত্র জুলিখা তাহার হাত চাপিয়া কহিল "দালিয়া, এখানকার রাজাকে দেখাইয়া দিতে পার?"

"পারি। কেন বল দেখি?"

"আমার একটা ছোরা আছে তাহার বুকের মধ্যে বসাইতে চাহি!"

প্রথমে দালিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গেল তাহার পরে জুলিখার হিংসাপ্রখর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল; যেন এত বড় মজার কথা সে ইতিপূর্ব্বে কখনও শোনে নাই—যদি পরিহাস বল ত এই বটে, রাজ-পুত্রীর উপযুক্ত। কোন কথা নাই বার্ত্তা নাই প্রথম আলাপেই একখানি ছোরার আধখানা একটা জীবন্ত রাজার বক্ষের মধ্যে চালনা করিয়া দিলে এইরূপ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ শিষ্টাচারে রাজাটা হঠাৎ কিরূপ অবাক্ হইয়া যায় সেই চিত্র ক্রমাগত তাহার মনে উদিত হইতে লাগিল, এবং তাহার নিঃশব্দ কৌতুক হাসি থাকিয়া থাকিয়া উচ্চহাস্যে পরিণত হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তাহার পরদিনেই রহমৎশেখ জুলিখাকে গোপনে পত্র লিখিল যে, আরাকানের নূতন রাজা ধীবরের কুটীরে দুই ভগ্নীর সন্ধান পাইয়াছেন, এবং গোপনে আমিনাকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। তাহাকে বিবাহার্থে অবিলম্বে প্রাসাদে আনিবার আয়োজন করিতেছেন। প্রতিহিংসার এমন সুন্দর অবসর আর পাওয়া যাইবে না।

তখন জুলিখা দৃঢ়ভাবে আমিনার হাত ধরিয়া কহিল "ঈশ্বরের ইচ্ছা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। আমিনা, এইবার

তোর জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিবার সময় আসিয়াছে, এখন আর খেলা ভাল দেখায় না।”

দালিয়া উপস্থিত ছিল, আমিনা তাহার মুখের দিকে চাহিল, দেখিল সে সকৌতুকে হাসিতেছে।

আমিনা তাহার হাসি দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া কহিল “জান দালিয়া, আমি রাজবধূ হইতে যাইতেছি।”

দালিয়া হাসিয়া বলিল “সে ত বেশিক্ষণের জন্য নয়।”

আমিনা পীড়িত বিস্মিত চিত্তে মনে মনে ভাবিল— বাস্তবিকই এ বনের মৃগ, এর সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করা আমারই পাগ্‌লামী।

আমিনা দালিয়াকে আর একটু সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য কহিল “রাজাকে মারিয়া আর কি আমি ফিরিব!”

দালিয়া কথাটা সঙ্গত জ্ঞান করিয়া কহিল “ফেরা কঠিন বটে।”

আমিনার সমস্ত অন্তরাত্মা একেবারে ম্লান হইয়া গেল। জুলিখার দিকে ফিরিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল “দিদি, আমি প্রস্তুত আছি।”

এবং দালিয়ার দিকে ফিরিয়া বিদ্ধ অন্তরে পরিহাসের ভাণ করিয়া কহিল “রাণী হইয়াই আমি প্রথমে তোমাকে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়া অপরাধে শাস্তি দিব তার পরে আর যাহা করিতে হয় করিব।”

শুনিয়া দালিয়া বিশেষ কৌতুক বোধ করিল, যেন

প্রস্তাবটা কার্য্যে পরিণত হইলে তাহার মধ্যে অনেকটা আমোদের বিষয় আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অশ্বারোহী পদাতিক নিশান হস্তী বাদ্য এবং আলোকে ধীবরের ঘর দুয়ার ভাঙ্গিয়া পড়িবার যো হইল। রাজপ্রাসাদ হইতে স্বর্ণমণ্ডিত দুই শিবিকা আসিয়াছে।

আমিনা জুলিখার হাত হইতে ছুরিখানি লইল। তাহার হস্তিদন্তনির্ম্মিত কারুকার্য্য অনেক ক্ষণ ধরিয়া দেখিল। তাহার পর বসন উদ্‌ঘাটন করিয়া নিজের বক্ষের উপর একবার ধার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। জীবনমুকুলের বৃন্তের কাছে ছুরিটি একবার স্পর্শ করিল, আবার সেটি খাপের মধ্যে পূরিয়া বসনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

একান্ত ইচ্ছা ছিল এই মরণ-যাত্রার পূর্ব্বে একবার দালিয়ার সহিত দেখা হয়, কিন্তু কাল হইতে সে নিরুদ্দেশ। দালিয়া সেই যে হাসিতেছিল তাহার ভিতরে কি অভিমানের জ্বালা প্রচ্ছন্ন ছিল?

শিবিকায় উঠিবার পূর্ব্বে আমিনা তাহার বাল্যকালের আশ্রয়টি অশ্রুজলের ভিতর হইতে একবার দেখিল, তাহার সেই ঘরের গাছ, তাহার সেই ঘরের নদী। ধীবরের হাত

ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কম্পিতস্বরে কহিল "বুঢ়া তবে চলিলাম। তিন্নি গেলে তোর ঘরকন্না কে দেখিবে!"

বুঢ়া একেবারে বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল।

আমিনা কহিল "বুঢ়া, যদি দালিয়া আর এখানে আসে, তাহাকে এই আংটি দিয়ো। বলিয়ো, তিন্নি যাইবার সময় দিয়া গেছে।"

এই বলিয়াই দ্রুত শিবিকায় উঠিয়া পড়িল। মহা সমারোহে শিবিকা চলিয়া গেল। আমিনার কুটীর, নদীতীর, কৈলুতরুতল অন্ধকার নিস্তব্ধ জনশূন্য হইয়া গেল।

যথাকালে শিবিকাদ্বয় তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। দুই ভগ্নী শিবিকা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল।

আমিনার মুখে হাসি নাই, চোখেও অশ্রুচিহ্ন নাই। জুলিখার মুখ বিবর্ণ।

কর্ত্তব্য যতক্ষণ দূরে ছিল ততক্ষণ তাহার উৎসাহের তীব্রতা ছিল—এখন সে কম্পিত হৃদয়ে ব্যাকুল স্নেহে আমিনাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল, মনে মনে কহিল নব প্রেমের বৃন্ত হইতে ছিন্ন করিয়া এই ফুটন্ত ফুলটিকে কোন্ রক্তস্রোতে ভাসাইতে যাইতেছি।

কিন্তু তখন আর ভাবিবার সময় নাই। পরিচারিকাদের দ্বারা নীত হইয়া শত সহস্র প্রদীপের অনিমেষ তীব্রদৃষ্টির মধ্য দিয়া স্বপ্নাহতের মত চলিতে লাগিল, অবশেষে, বাসরঘরের

দ্বারের কাছে মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া আমিনা জুলিখাকে কহিল "দিদি!"

জুলিখা আমিনাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া চুম্বন করিল। উভয়ে ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল।

রাজবেশ পরিয়া ঘরের মাঝখানে মছলন্দ শয্যার উপর রাজা বসিয়া আছেন। আমিনা সসঙ্কোচে দ্বারের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

জুলিখা অগ্রসর হইয়া রাজার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল রাজা নিঃশব্দে সকৌতুকে হাসিতেছেন।

জুলিখা বলিয়া উঠিল "দালিয়া।" আমিনা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

দালিয়া উঠিয়া তাহাকে আহত পাখীটির মত কোলে করিয়া তুলিয়া শয্যায় লইয়া গেল। আমিনা সচেতন হইয়া বুকের মধ্য হইতে ছুরিটি বাহির করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিল, দিদি দালিয়ার মুখের দিকে চাহিল, দালিয়া চুপ করিয়া হাস্যমুখে উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল, ছুরিও তাহার খাপের মধ্য হইতে একটুখানি মুখ বাহির করিয়া এই রঙ্গ দেখিয়া ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

জীবিত ও মৃত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাণীহাটের জমিদার শারদাশঙ্কর বাবুদের বাড়ির বিধবা বধূটির পিতৃকুলে কেহ ছিল না; সকলেই একে একে মারা গিয়াছে। পতিকুলেও ঠিক আপনার বলিতে কেহ নাই, পতিও নাই পুত্রও নাই। একটি ভাসুরপো, শারদাশঙ্করের ছোট ছেলেটি, সেই তাহার চক্ষের মণি ছিল। সে জন্মিবার পর তাহার মাতার বহুকাল ধরিয়া শক্ত পীড়া হইয়াছিল সেইজন্য এই বিধবা কাকী কাদম্বিনীই তাহাকে মানুষ করিয়াছিল। পরের ছেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান আরো যেন বেশি হয়, কারণ, তাহার উপরে অধিকার থাকে না;—তাহার উপরে কোন সামাজিক দাবী নাই কেবল স্নেহের দাবী—কিন্তু কেবলমাত্র স্নেহ সমাজের সমক্ষে আপনার দাবী কোন দলিল অনুসারে সপ্রমাণ করিতে পারে না এবং চাহেও না, কেবল অনিশ্চিত প্রাণের ধনটিকে দ্বিগুণ ব্যাকুলতার সহিত ভালবাসে।

বিধবার সমস্ত রুদ্ধ প্রীতি এই ছোট ছেলেটির প্রতি সিঞ্চন করিয়া একদিন শ্রাবণের রাত্রে কাদম্বিনীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। হঠাৎ কি কারণে তাহার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হইয়া গেল—সময় জগতের আর সর্ব্বত্রই চলিতে লাগিল কেবল

সেই স্নেহকাতর ক্ষুদ্র কোমল বক্ষটির ভিতর সময়ের ঘড়ির কল চিরকালের মত বন্ধ হইয়া গেল।

পাছে পুলিসের উপদ্রব ঘটে এই জন্য অধিক আড়ম্বর না করিয়া জমিদারের চারিজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী অনতিবিলম্বে মৃতদেহ দাহ করিতে লইয়া গেল।

রাণীহাটের শ্মশান লোকালয় হইতে বহুদূরে। পুষ্করিণীর ধারে একখানি কুটীর, এবং তাহার নিকটে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, বৃহৎ মাঠে আর কোথাও কিছু নাই। পূর্ব্বে এই-খান দিয়া নদী বহিত, এখন নদী একেবারে শুকাইয়া গেছে; সেই শুষ্ক জলপথের এক অংশ খনন করিয়া শ্মশানের পুষ্ক-রিণী নির্ম্মিত হইয়াছে। এখনকার লোকেরা এই পুষ্করিণী-কেই পুণ্য স্রোতস্বিনীর প্রতিনিধিস্বরূপ জ্ঞান করে।

মৃতদেহ কুটীরের মধ্যে স্থাপন করিয়া চিতার কাঠ আসি-বার প্রতীক্ষায় চারজনে বসিয়া রহিল। সময় এত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল যে অধীর হইয়া চারিজনের মধ্যে নিতাই এবং গুরুচরণ কাঠ আনিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন দেখিতে গেল, বিধু এবং বনমালী মৃতদেহ রক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রি। থমথমে মেঘ করিয়া আছে, আকাশে একটি তারা দেখা যায় না। অন্ধকার ঘরে দুই জনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একজনের চাদরে দিয়াশলাই এবং বাতি বাঁধা ছিল। বর্ষাকালের দিয়াশলাই বহুচেষ্টাতেও জ্বলিল না—যে লণ্ঠন সঙ্গে ছিল তাহাও নিবিয়া গেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একজন কহিল "ভাইরে এক ছিলিম তামাকের যোগাড় থাকিলে বড় সুবিধা হইত। তাড়াতাড়িতে কিছুই আনা হয় নাই!"

অন্য ব্যক্তি কহিল "আমি চট্ করিয়া এক দৌড়ে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারি!"

বনমালীর পলায়নের অভিপ্রায় বুঝিয়া বিধু কহিল—"মাইরি! আর আমি বুঝি এখানে একলা বসিয়া থাকিব!"

আবার কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল। পাঁচ মিনিটকে এক ঘণ্টা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যাহারা কাঠ আনিতে গিয়াছিল তাহাদিগকে মনে মনে ইহারা গালি দিতে লাগিল—তাহারা যে দিব্য আরামে কোথাও বসিয়া গল্প করিতে করিতে তামাক খাইতেছে, এ সন্দেহ ক্রমশই তাহাদের মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কোথাও কিছু শব্দ নাই—কেবল পুষ্করিণীতীর হইতে অবিশ্রাম ঝিল্লি এবং ভেকের ডাক শুনা যাইতে লাগিল। এমন সময় মনে হইল যেন খাটটা ঈষৎ নড়িল—যেন মৃতদেহ পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিধু এবং বনমালী রামনাম জপিতে জপিতে কাঁপিতে লাগিল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস শুনা গেল। বিধু এবং বনমালী এক মুহূর্ত্তে ঘর হইতে লম্ফ দিয়া বাহির হইয়া গ্রামের অভিমুখে দৌড় দিল।

প্রায় ক্রোশ দেড়েক পথ গিয়া দেখিল তাহার অবশিষ্ট

দুই সঙ্গী লণ্ঠন হাতে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহারা বাস্তবিকই তামাক খাইতে গিয়াছিল, কাঠের কোন খবর জানে না, তথাপি সংবাদ দিল গাছ কাটিয়া কাঠ ফাড়াইতেছে—অনতিবিলম্বে রওনা হইবে। তখন বিধু এবং বনমালী কুটীরের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। নিতাই এবং গুরুচরণ অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিল, এবং কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া আসার জন্য অপর দুইজনের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিয়া বিস্তর ভৎর্সনা করিতে লাগিল।

কালবিলম্ব না করিয়া চারজনেই শ্মশানে সেই কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মৃতদেহ নাই, শূন্য খাট পড়িয়া আছে।

পরস্পর মুখ চাহিয়া রহিল। যদি শৃগালে লইয়া গিয়া থাকে? কিন্তু আচ্ছাদনবস্ত্রটি পর্য্যন্ত নাই। সন্ধান করিতে করিতে বাহিরে গিয়া দেখে, কুটীরের দ্বারের কাছে খানিকটা কাদা জমিয়াছিল তাহাতে স্ত্রীলোকের সদ্য এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্ন।

শারদাশঙ্কর সহজ লোক নহেন, তাঁহাকে এই ভূতের গল্প বলিলে হঠাৎ যে কোন শুভফল পাওয়া যাইবে এমন সম্ভাবনা নাই। তখন চারজনে বিস্তর পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, দাহকার্য্য সমাধা হইয়াছে এইরূপ খবর দেওয়াই ভাল।

ভোরের দিকে যাহারা কাঠ লইয়া আসিল, তাহারা সংবাদ পাইল, বিলম্ব দেখিয়া পূর্ব্বেই কার্য্য শেষ করা হইয়াছে, কুটীরের মধ্যে কাষ্ঠ সঞ্চিত ছিল। এ সম্বন্ধে কাহারো

সহজে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না—কারণ, মৃতদেহ এমন কিছু বহুমূল্য সম্পত্তি নহে যে, কেহ ফাঁকি দিয়া চুরি করিয়া লইয়া যাইবে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সকলেই জানেন জীবনের যখন কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না তখনো অনেক সময় জীবন প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, এবং সময়মত পুনর্ব্বার মৃতবৎ দেহে তাহার কার্য্য আরম্ভ হয়। কাদম্বিনীও মরে নাই—হঠাৎ কি কারণে তাহার জীবনের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

যখন সে সচেতন হইয়া উঠিল, দেখিল চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার। চিরাভ্যাসমত যেখানে শয়ন করিয়া থাকে মনে হইল এটা সে জায়গা নহে। একবার ডাকিল—"দিদি"—অন্ধকার ঘরে কেহ সাড়া দিল না। সভয়ে উঠিয়া বসিল, মনে পড়িল সেই মৃত্যুশয্যার কথা। সেই হঠাৎ বক্ষের কাছে একটা বেদনা—শ্বাসরোধের উপক্রম। তাহার বড় যা ঘরের কোণে বসিয়া একটা অগ্নিকুণ্ডের উপর খোকার জন্য দুধ গরম করিতেছিল—কাদম্বিনী আর দাঁড়াইতে না পারিয়া বিছানার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল—রুদ্ধকণ্ঠে কহিল "দিদি, একবার খোকাকে আনিয়া দাও—আমার প্রাণ কেমন করিতেছে!" তাহার পর সমস্ত কালো হইয়া আসিল—যেন

একটি লেখা খাতার উপরে দোয়াত-সুদ্ধ কালী গড়াইয়া পড়িল—কাদম্বিনীর সমস্ত স্মৃতি এবং চেতনা, বিশ্বগ্রন্থের সমস্ত অক্ষর এক মুহূর্ত্তে একাকার হইয়া গেল। খোকা তাহাকে একবার শেষবারের মত তাহার সেই সুমিষ্ট ভাল-বাসার স্বরে কাকীমা বলিয়া ডাকিয়াছিল কি না, তাহার অনন্ত অজ্ঞাত মরণযাত্রার পথে চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে এই শেষ স্নেহ-পাথেয়টুকু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল কি না বিধবার তাহাও মনে পড়ে না।

প্রথমে মনে হইল যমালয় বুঝি এইরূপ চিরনির্জ্জন এবং চিরান্ধকার। সেখানে কিছুই দেখিবার নাই, শুনিবার নাই, কাজ করিবার নাই, কেবল চিরকাল এইরূপ উঠিয়া জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

তাহার পর যখন মুক্তদ্বার দিয়া হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাদ্-লার বাতাস দিল এবং বর্ষার ভেকের ডাক কানে প্রবেশ করিল তখন এক মুহূর্ত্তে তাহার এই স্বল্প-জীবনের আশৈশব সমস্ত বর্ষার স্মৃতি ঘনীভূতভাবে তাহার মনে উদয় হইল এবং পৃথিবীর নিকট-সংস্পর্শ সে অনুভব করিতে পারিল। একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল—সম্মুখে পুষ্করিণী, বটগাছ, বৃহৎ মাঠ এবং সুদূর তরুশ্রেণী এক পলকে চখে পড়িল। মনে পড়িল মাঝে মাঝে পুণ্য তিথি উপলক্ষে এই পুষ্করিণীতে আসিয়া স্নান করিয়াছে, এবং মনে পড়িল সেই সময়ে এই শ্মশানে মৃতদেহ দেখিয়া মৃত্যুকে কি ভয়ানক মনে হইত!

প্রথমেই মনে হইল, বাড়ি ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তখনি ভাবিল, আমি ত বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়িতে ফিরিয়া লইবে কেন? সেখানে যে অমঙ্গল হইবে। জীব-রাজ্য হইতে আমি যে নির্ব্বাসিত হইয়া আসিয়াছি—আমি যে আমার প্রেতাত্মা।

তাই যদি না হইবে তবে সে এই অর্দ্ধরাত্রে শারদাশঙ্করের সুরক্ষিত অন্তঃপুর হইতে এই দুর্গম শ্মশানে আসিল কেমন করিয়া? এখনও যদি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ না হইয়া থাকে তবে দাহ করিবার লোকজন গেল কোথায়? শারদাশঙ্করের আলোকিত গৃহে তাহার মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত মনে পড়িল, তাহার পরেই এই বহুদূরবর্ত্তী জনশূন্য অন্ধকার শ্মশানের মধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া সে জানিল আমি এই পৃথিবীর জন-সমাজের আর কেহ নহি—আমি অতি ভীষণ, অকল্যাণ-কারিণী; আমি আমার প্রেতাত্মা!

এই কথা মনে উদয় হইবামাত্রই তাহার মনে হইল, তাহার চতুর্দ্দিক হইতে বিশ্বনিয়মের সমস্ত বন্ধন যেন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যেন তাহার অদ্ভুত শক্তি, অসীম স্বাধীনতা—যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে। এই অভূতপূর্ব্ব নূতন ভাবের আবির্ভাবে সে উন্মত্তের মত হইয়া হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাসের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার শ্মশানের উপর দিয়া চলিল—মনে লজ্জা ভয় ভাবনার লেশমাত্র রহিল না।

চলিতে চলিতে চরণ শ্রান্ত, দেহ দুর্ব্বল হইয়া আসিতে লাগিল। মাঠের পর মাঠ আর শেষ হয় না—মাঝে মাঝে ধান্য-ক্ষেত্র—কোথাও বা এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়া আছে। যখন ভোরের আলো অল্প অল্প দেখা দিল তখন অদূরে লোকালয়ের বাঁশঝাড় হইতে দুটো একটা পাখীর ডাক শুনা গেল।

তখন তাহার কেমন ভয় করিতে লাগিল। পৃথিবীর সহিত জীবিত মনুষ্যের সহিত এখন তাহার কিরূপ নূতন সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে সে কিছুই জানে না। যতক্ষণ মাঠে ছিল, শ্মশানে ছিল, শ্রাবণরজনীর অন্ধকারের মধ্যে ছিল ততক্ষণ সে যেন নির্ভয়ে ছিল, যেন আপন রাজ্যে ছিল। দিনের আলোকে লোকালয় তাহার পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর স্থান বলিয়া বোধ হইল। মানুষ ভূতকে ভয় করে, ভূতও মানুষকে ভয় করে, মৃত্যু-নদীর দুই পারে দুইজনের বাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কাপড়ে কাদা মাখিয়া, অদ্ভুত ভাবের বশে ও রাত্রি জাগরণে পাগলের মত হইয়া, কাদম্বিনীর যেরূপ চেহারা হইয়াছিল তাহাতে মানুষ তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইতে পারিত, এবং ছেলেরা বোধ হয় দূরে পলাইয়া গিয়া তাহাকে ঢেলা মারিত। সৌভাগ্যক্রমে একটি পথিক ভদ্রলোক তাহাকে সর্ব্বপ্রথমে এই অবস্থায় দেখিতে পায়।

সে আসিয়া কহিল "মা, তোমাকে ভদ্রকুলবধূ বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি এ অবস্থায় একলা পথে কোথায় চলিয়াছ ?"

কাদম্বিনী প্রথমে কোন উত্তর না দিয়া তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সে যে সংসারের মধ্যে আছে, তাহাকে যে ভদ্রকুলবধূর মত দেখাইতেছে, গ্রামের পথে পথিক তাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ সমস্তই তাহার কাছে অভাবনীয় বলিয়া বোধ হইল।

পথিক তাহাকে পুনশ্চ কহিল—"চল, মা, আমি তোমাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিই—তোমার বাড়ি কোথায় আমাকে বল।"

কাদম্বিনী চিন্তা করিতে লাগিল। শ্বশুরবাড়ি ফিরিবার কথা মনে স্থান দেওয়া যায় না, বাপের বাড়ি ত নাই—তখন ছেলেবেলার সইকে মনে পড়িল।

সই যোগমায়ার সহিত যদিও ছেলেবেলা হইতেই বিচ্ছেদ তথাপি মাঝে মাঝে চিঠিপত্র চলে। এক এক সময় রীতিমত ভালবাসার লড়াই চলিতে থাকে—কাদম্বিনী জানাইতে চাহে ভালবাসা তাহার দিকেই প্রবল, যোগমায়া জানাইতে চাহে কাদম্বিনী তাহার ভালবাসার যথোপযুক্ত প্রতিদান দেয় না। কোন সুযোগে একবার উভয়ে মিলন হইতে পারিলে যে একদণ্ড কেহ কাহাকে চোখের আড়াল করিতে পারিবে না এ বিষয়ে কোন পক্ষেরই কোন সন্দেহ ছিল না।

কাদম্বিনী ভদ্রলোকটিকে কহিল "নিশিন্দাপুরে শ্রীপতিচরণ বাবুর বাড়ি যাইব।"

পথিক কলিকাতায় যাইতেছিলেন; নিশিন্দাপুর যদিও নিকটবর্ত্তী নহে তথাপি তাঁহার গম্য পথেই পড়ে। তিনি স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া কাদম্বিনীকে শ্রীপতিচরণ বাবুর বাড়ি পৌঁছাইয়া দিলেন।

দুই সইয়ে মিলন হইল। প্রথমে চিনিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল, তাহার পরে বাল্যসাদৃশ্য উভয়ের চক্ষে ক্রমশই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

যোগমায়া কহিল "ওমা, আমার কি ভাগ্য! তোমার যে দর্শন পাইব এমন ত আমার মনেই ছিল না। কিন্তু ভাই, তুমি কি করিয়া আসিলে! তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যে তোমাকে ছাড়িয়া দিল!"

কাদম্বিনী চুপ করিয়া রহিল—অবশেষে কহিল "ভাই, শ্বশুরবাড়ির কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না! আমাকে দাসীর মত বাড়ির এক প্রান্তে স্থান দিয়ো, আমি তোমাদের কাজ করিয়া দিব!"

যোগমায়া কহিল "ওমা সে কি কথা! দাসীর মত থাকিবে কেন! তুমি আমার সই, তুমি আমার"—ইত্যাদি।

এমন সময় শ্রীপতি ঘরে প্রবেশ করিল। কাদম্বিনী খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে ঘর

হইতে বাহির হইয়া গেল—মাথায় কাপড় দেওয়া, বা কোন-রূপ সঙ্কোচ বা সম্ভ্রমের লক্ষণ দেখা গেল না।

পাছে তাহার সইয়ের বিরুদ্ধে শ্রীপতি কিছু মনে করে এজন্য ব্যস্ত হইয়া যোগমায়া নানারূপে তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এতই অল্প বুঝাইতে হইল এবং শ্রীপতি এত সহজে যোগমায়ার সমস্ত প্রস্তাবে অনুমোদন করিল, যে, যোগমায়া মনে মনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইল না।

কাদম্বিনী সইয়ের বাড়িতে আসিল, কিন্তু সইয়ের সঙ্গে মিশিতে পারিল না—মাঝে মৃত্যুর ব্যবধান। আত্মসম্বন্ধে সর্ব্বদা একটা সন্দেহ এবং চেতনা থাকিলে পরের সঙ্গে মেলা যায় না। কাদম্বিনী যোগমায়ার মুখের দিকে চায় এবং কি যেন ভাবে—মনে করে স্বামী এবং ঘরকন্না লইয়া ও যেন বহুদূরে আর এক জগতে আছে। স্নেহমমতা এবং সমস্ত কর্ত্তব্য লইয়া ও যেন পৃথিবীর লোক, আর আমি যেন শূন্য ছায়া। ও যেন অস্তিত্বের দেশে, আর আমি যেন অনন্তের মধ্যে।

যোগমায়ারও কেমন কেমন লাগিল—কিছুই বুঝিতে পারিল না। স্ত্রীলোক রহস্য সহ্য করিতে পারে না—কারণ, অনিশ্চিতকে লইয়া কবিত্ব করা যায়, বীরত্ব করা যায়, পাণ্ডিত্য করা যায়, কিন্তু ঘরকন্না করা যায় না। এই জন্য স্ত্রীলোক যেটা বুঝিতে পারে না, হয় সেটার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া তাহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না, নয় তাহাকে

স্বহস্তে নূতন মূর্ত্তি দিয়া নিজের ব্যবহারযোগ্য একটি সামগ্রী গড়িয়া তোলে—যদি দুইয়ের কোনটাই না পারে তবে তাহার উপর ভারি রাগ করিতে থাকে।

কাদম্বিনী যতই দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিল যোগমায়া তাহার উপর ততই রাগ করিতে লাগিল, ভাবিল, এ কি উপদ্রব স্কন্ধের উপর চাপিল?

আবার আর এক বিপদ। কাদম্বিনীর আপনাকে আপনি ভয় করে। সে নিজের কাছ হইতে নিজে কিছুতেই পলাইতে পারে না। যাহাদের ভূতের ভয় আছে তাহারা আপনার পশ্চাদ্দিক্‌কে ভয় করে—যেখানে দৃষ্টি রাখিতে পারে না সেইখানেই ভয়। কিন্তু, কাদম্বিনীর আপনার মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশি ভয়—বাহিরে তার ভয় নাই।

এই জন্য বিজন দ্বিপ্রহরে সে একা ঘরে এক এক দিন চীৎকার করিয়া উঠিত—এবং সন্ধ্যাবেলায় দীপালোকে আপনার ছায়া দেখিলে তাহার গা ছম্‌-ছম্ করিতে থাকিত।

তাহার এই ভয় দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মনে কেমন একটা ভয় জন্মিয়া গেল। চাকরদাসীরা এবং যোগমায়াও যখন তখন যেখানে সেখানে ভূত দেখিতে আরম্ভ করিল।

একদিন এমন হইল, কাদম্বিনী অর্দ্ধরাত্রে আপন শয়নগৃহ হইতে কাঁদিয়া বাহির হইয়া একেবারে যোগমায়ার গৃহদ্বারে আসিয়া কহিল—"দিদি, দিদি, তোমাদের দুটি পায়ে পড়ি গো! আমাকে একলা ফেলিয়া রাখিয়ো না।"

যোগমায়ার যেমন ভয়ও পাইল, তেমনি রাগও হইল। ইচ্ছা করিল তদ্দণ্ডেই কাদম্বিনীকে দূর করিয়া দেয়। দয়া-পরবশ শ্রীপতি অনেক চেষ্টায় তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া পার্শ্ব-বর্ত্তী গৃহে স্থান দিল।

পরদিন অসময়ে অন্তঃপুরে শ্রীপতির তলব হইল। যোগ-মায়া তাহাকে অকস্মাৎ ভৎ‍র্সনা করিতে আরম্ভ করিল—"হাঁ গা, তুমি কেমনধারা লোক! একজন মেয়েমানুষ আপন শ্বশুরঘর ছাড়িয়া তোমার ঘরে আসিয়া অধিষ্ঠান হইল মাস-খানেক হইয়া গেল তবু যাইবার নাম করে না, আর তোমার মুখে যে একটি আপত্তি মাত্র শুনি না! তোমার মনের ভাবটা কি বুঝাইয়া বল দেখি। তোমরা পুরুষ মানুষ এম্‌নি জাতই বটে!"

বাস্তবিক সাধারণ স্ত্রীজাতির পরে পুরুষ মানুষের একটা নির্ব্বিচার পক্ষপাত আছে, এবং সে জন্য স্ত্রীলোকেরাই তাহা-দিগকে অধিক অপরাধী করে। নিঃসহায়া অথচ সুন্দরী কাদম্বিনীর প্রতি শ্রীপতির করুণা যে, যথোচিত মাত্রার চেয়ে কিঞ্চিৎ অধিক ছিল তাহার বিরুদ্ধে তিনি যোগমায়ার গাত্র স্পর্শপূর্ব্বক শপথ করিতে উদ্যত হইলেও তাঁহার ব্যবহারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত না।

তিনি মনে করিতেন নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এই পুত্রহীনা বিধবার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিত তাই নিতান্ত সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইয়া কাদম্বিনী আমার আশ্রয়

লইয়াছে। যখন ইহার বাপ মা কেহই নাই, তখন আমি ইহাকে কি করিয়া ত্যাগ করি!—এই বলিয়া তিনি কোন-রূপ সন্ধান লইতে ক্ষান্ত ছিলেন, এবং কাদম্বিনীকেও এই অপ্রীতিকর বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ব্যথিত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না।

তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার অসাড় কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে নানা-প্রকার আঘাত দিতে লাগিল। কাদম্বিনীর শ্বশুরবাড়িতে খবর দেওয়া যে তাঁহার গৃহের শান্তিরক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন হঠাৎ চিঠি লিখিয়া বসিলে ভাল ফল নাও হইতে পারে, অতএব রাণিহাটে তিনি নিজে গিয়া সন্ধান লইয়া যাহা কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

শ্রীপতি ত গেলেন, এদিকে যোগমায়া আসিয়া কাদম্বিনীকে কহিলেন "সই, এখানে তোমার আর থাকা ভাল দেখাইতেছে না! লোকে বলিবে কি!"

কাদম্বিনী গম্ভীর ভাবে যোগমায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল "লোকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?"

যোগমায়া কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ রাগিয়া কহিল "তোমার না থাকে, আমাদের ত আছে! আমরা পরের ঘরের বধূকে কি বলিয়া আটক করিয়া রাখিব!"

কাদম্বিনী কহিল "আমার শ্বশুরঘর কোথায়?"

যোগমায়া ভাবিল—"আ মরণ! পোড়াকপালী বলে কি?"

কাদম্বিনী ধীরে ধীরে কহিল—"আমি কি তোমাদের কেহ? আমি কি এ পৃথিবীর? তোমরা হাসিতেছ, কাঁদিতেছ, ভালবাসিতেছ, সবাই আপন আপন লইয়া আছ, আমি ত কেবল চাহিয়া আছি! তোমরা মানুষ, আর আমি ছায়া! বুঝিতে পারি না, ভগবান আমাকে তোমাদের এই সংসারের মাঝখানে কেন রাখিয়াছেন!"

এম্‌নি ভাবে চাহিয়া কথাগুলা বলিয়া গেল, যে, যোগমায়া কেমন একরকম করিয়া মোটের উপর একটা কি বুঝিতে পারিল কিন্তু আসল কথাটা বুঝিল না, জবাবও দিতে পারিল না, দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিতেও পারিল না। অত্যন্ত ভারগ্রস্ত গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় যখন দশটা তখন শ্রীপতি রাণীহাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মুষলধারে বৃষ্টিতে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। ক্রমাগতই তাহার ঝর্ ঝর্ শব্দে মনে হইতেছে বৃষ্টির শেষ নাই, আজ রাত্রিরও শেষ নাই।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইল!"

শ্রীপতি কহিলেন "সে অনেক কথা। পরে হইবে।" বলিয়া কাপড় ছাড়িয়া আহার করিলেন। এবং তামাক খাইয়া শুইতে গেলেন। ভাবটা অত্যন্ত চিন্তিত।

যোগমায়া অনেকক্ষণ কৌতূহল দমন করিয়া ছিলেন, শয্যায় প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি শুনিলে বল ?"

শ্রীপতি কহিলেন "নিশ্চয় তুমি একটা ভুল করিয়াছ।"

শুনিবামাত্র যোগমায়া মনে মনে ঈষৎ রাগ করিলেন। ভুল মেয়েরা কখনই করে না, যদি বা করে কোন সুবুদ্ধি পুরুষের সেটা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য হয় না, নিজের ঘাড়ে পাতিয়া লওয়াই সুযুক্তি। যোগমায়া কিঞ্চিৎ উষ্ণভাবে কহিলেন "কিরকম শুনি!"

শ্রীপতি কহিলেন "যে স্ত্রীলোকটিকে তোমার ঘরে স্থান দিয়াছ সে তোমার সই কাদম্বিনী নহে!"

এমনতর কথা শুনিলে সহজেই রাগ হইতে পারে—বিশেষতঃ নিজের স্বামীর মুখে শুনিলে ত কথাই নাই। যোগমায়া কহিলেন "আমার সইকে আমি চিনিনা, তোমার কাছ হইতে চিনিয়া লইতে হইবে—কি কথার শ্রী!"—

শ্রীপতি বুঝাইলেন এস্থলে কথার শ্রী লইয়া কোনরূপ তর্ক হইতেছে না, প্রমাণ দেখিতে হইবে। যোগমায়ার সই কাদম্বিনী যে মারা গিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যোগমায়া কহিলেন—"ঐ শোন। তুমি নিশ্চয় একটা গোল পাকাইয়া আসিয়াছ! কোথায় যাইতে কোথায় গিয়াছ, কি কি শুনিয়াছ তাহার ঠিক নাই! তোমাকে নিজে যাইতে কে বলিল, একখানা চিঠি লিখিয়া দিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইত।"

নিজের কর্ম্মপটুতার প্রতি স্ত্রীর এইরূপ বিশ্বাসের অভাবে শ্রীপতি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বিস্তারিত ভাবে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন—কিন্তু কোন ফল হইল না। উভয়পক্ষে হাঁ না করিতে করিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গেল।

যদিও কাদম্বিনীকে এই দণ্ডেই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে স্বামী স্ত্রী কাহারো মতভেদ ছিল না—কারণ শ্রীপতির বিশ্বাস তাঁহার অতিথি ছদ্মপরিচয়ে তাঁহার স্ত্রীকে এতদিন প্রতারণা করিয়াছে এবং যোগমায়ার বিশ্বাস সে কুলত্যাগিনী—তথাপি উপস্থিত তর্কটা সম্বন্ধে উভয়ের কেহই হার মানিতে চাহেন না।

উভয়ের কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল, ভুলিয়া গেলেন পাশের ঘরেই কাদম্বিনী শুইয়া আছে।

একজন বলেন "ভাল বিপদেই পড়া গেল! আমি নিজের কানে শুনিয়া আসিলাম!"

আর একজন দৃঢ়স্বরে বলেন "সে কথা বলিলে মানিব কেন, আমি নিজের চক্ষে দেখিতেছি!"

অবশেষে যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা কাদম্বিনী কবে মরিল বল দেখি।"

ভাবিলেন, কাদম্বিনীর কোন একটা চিঠির তারিখের সহিত অনৈক্য বাহির করিয়া শ্রীপতির ভ্রম সপ্রমাণ করিয়া দিবেন।

শ্রীপতি যে তারিখের কথা বলিলেন, উভয়ে হিসাব করিয়া দেখিলেন, যেদিন সন্ধ্যাবেলায় কাদম্বিনী তাঁহাদের বাড়িতে আসে সে তারিখ ঠিক তাহার পূর্ব্বের দিনেই পড়ে! শুনিবামাত্র যোগমায়ার বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল, শ্রীপতিরও কেমন একরকম বোধ হইতে লাগিল।

এমন সময়ে তাঁহাদের ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল, একটা বাদলার বাতাস আসিয়া প্রদীপটা ফস করিয়া নিবিয়া গেল। বাহিরের অন্ধকার প্রবেশ করিয়া এক মুহূর্ত্তে সমস্ত ঘরটা আগাগোড়া ভরিয়া গেল। কাদম্বিনী একেবারে ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন রাত্রি আড়াই প্রহর হইয়া গিয়াছে, বাহিরে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে।

কাদম্বিনী কহিল—"সই, আমি তোমার সেই কাদম্বিনী, কিন্তু এখন আমি আর বাঁচিয়া নাই। আমি মরিয়া আছি!"

যোগমায়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—শ্রীপতির বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

"কিন্তু আমি মরিয়াছি ছাড়া তোমাদের কাছে আর কি অপরাধ করিয়াছি! আমার যদি ইহলোকেও স্থান নাই, পরলোকেও স্থান নাই—ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব!" তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া যেন এই গভীর বর্ষানিশীথে সুপ্ত বিধাতাকে জাগ্রত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ওগো, আমি তবে কোথায় যাব!"—

এই বলিয়া মূর্চ্ছিত দম্পতিকে অন্ধকার ঘরে ফেলিয়া বিশ্বজগতে কাদম্বিনী আপনার স্থান খুঁজিতে গেল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কাদম্বিনী যে কেমন করিয়া রাণীহাটে ফিরিয়া গেল তাহা বলা কঠিন। কিন্তু প্রথমে কাহাকেও দেখা দিল না। সমস্ত দিন অনাহারে একটা ভাঙ্গা পোড়ো মন্দিরে যাপন করিল।

বর্ষার অকাল সন্ধ্যা যখন অত্যন্ত ঘন হইয়া আসিল এবং আসন্ন দুর্য্যোগের আশঙ্কায় গ্রামের লোকেরা ব্যস্ত হইয়া আপন আপন গৃহ আশ্রয় করিল তখন কাদম্বিনী পথে বাহির হইল। শ্বশুরবাড়ির দ্বারে গিয়া একবার তাহার হৃৎ-কম্প উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু মস্ত ঘোমটা টানিয়া যখন ভিতরে প্রবেশ করিল দাসীভ্রমে দ্বারীরা কোনরূপ বাধা দিল না। এমন সময় বৃষ্টি খুব চাপিয়া আসিল, বাতাসও বেগে বহিতে লাগিল।

তখন বাড়ীর গৃহিণী শারদাশঙ্করের স্ত্রী তাঁহার বিধবা ননদের সহিত তাস খেলিতেছিলেন। ঝি ছিল রান্নাঘরে, এবং পীড়িত খোকা জ্বরের উপশমে শয়নগৃহে বিছানায় ঘুমা-ইতেছিল। কাদম্বিনী সকলের চক্ষু এড়াইয়া সেই ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। সে যে কি ভাবিয়া শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিল জানি না, সে নিজেও জানে না, কেবল এইটুকু জানে যে,

একবার খোকাকে চক্ষে দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা। তাহার পর কোথায় যাইবে কি হইবে, সে কথা সে ভাবেও নাই।

দীপালোকে দেখিল রুগ্ন শীর্ণ খোকা হাত মুঠা করিয়া ঘুমাইয়া আছে। দেখিয়া উত্তপ্ত হৃদয় যেন তৃষাতুর হইয়া উঠিল—তাহার সমস্ত বালাই লইয়া তাহাকে একবার বুকে না চাপিয়া ধরিলে কি বাঁচা যায়! আর, তাহার পর মনে পড়িল, আমি নাই, ইহাকে দেখিবার কে আছে! ইহার মা সঙ্গ ভালবাসে, গল্প ভালবাসে, খেলা ভালবাসে, এতদিন আমার হাতে ভার দিয়াই সে নিশ্চিন্ত ছিল, কখন তাহাকে ছেলে মানুষ করিবার কোন দায় পোহাইতে হয় নাই। আজ ইহাকে কে তেমন করিয়া যত্ন করিবে!—

এমন সময়ে খোকা হঠাৎ পাশ ফিরিয়া অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় বলিয়া উঠিল—"কাকীমা, জল দে!"—আ মরিয়া যাই! সোনা আমার, তোর কাকীমাকে এখনো ভুলিস্ নাই। তাড়াতাড়ি কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া খোকাকে বুকের উপর তুলিয়া কাদম্বিনী তাহাকে জল পান করাইল।

যতক্ষণ ঘুমের ঘোর ছিল, চিরাভ্যাসমত কাকীমার হাত হইতে জল খাইতে খোকার-কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হইল না। অবশেষে কাদম্বিনী যখন বহুকালের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে আবার শুয়াইয়া দিল, তখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, এবং কাকীমাকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকীমা, তুই মরে' গিয়েছিলি?"

কাকীমা কহিল "হাঁ খোকা!"

"আবার তুই খোকার কাছে ফিরে এসেছিস? আর তুই মরে' যাবিনে?"

ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একটা গোল বাধিল—ঝি এক বাটি সাগু হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, হঠাৎ বাটি ফেলিয়া মাগো বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

চীৎকার শুনিয়া তাস ফেলিয়া গিন্নি ছুটিয়া আসিলেন, ঘরে ঢুকিতেই তিনি একেবারে কাঠের মত হইয়া গেলেন, পলাইতেও পারিলেন না, মুখ দিয়া একটি কথাও সরিল না!

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া খোকারও মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল—সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল—"কাকীমা, তুই যা!"

কাদম্বিনী অনেক দিন পরে আজ অনুভব করিয়াছে যে, সে মরে নাই—সেই পুরাতন ঘর দ্বার, সেই সমস্ত, সেই খোকা, সেই স্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবন্ত ভাবেই আছে, মধ্যে কোন বিচ্ছেদ কোন ব্যবধান জন্মায় নাই।—সইয়ের বাড়ি গিয়া অনুভব করিয়াছিল বাল্যকালের সে সই মরিয়া গিয়াছে—খোকার ঘরে আসিয়া বুঝিতে পারিল, খোকার কাকীমা ত এক তিলও মরে নাই।

ব্যাকুল ভাবে কহিল, "দিদি, তোমরা আমাকে দেখিয়া কেন ভয় পাইতেছ! এই দেখ, আমি তোমাদের সেই তেমনি আছি!"

গিন্নি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

ভগ্নীর কাছে সংবাদ পাইয়া শারদাশঙ্কর বাবু স্বয়ং অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—তিনি যোড়হস্তে কাদম্বিনীকে কহিলেন "ছোট বৌমা, এই কি তোমার উচিত হয়। সতীশ আমার বংশের একমাত্র ছেলে, উহার প্রতি তুমি কেন দৃষ্টি দিতেছ? আমরা কি তোমার পর? তুমি যাওয়ার পর হইতে ও প্রতিদিন শুকাইয়া যাইতেছে উহার ব্যামো আর ছাড়ে না, দিনরাত কেবল কাকীমা কাকীমা করে। যখন সংসার হইতে বিদায় লইয়াছ তখন এ মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া যাও—আমরা তোমার যথোচিত সৎকার করিব!"—

তখন কাদম্বিনী আর সহিতে পারিল না, তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ওগো, আমি মরি নাই গো মরি নাই! আমি কেমন করিয়া তোমাদের বুঝাইব আমি মরি নাই! এই দেখ আমি বাঁচিয়া আছি!"

বলিয়া কাঁসার বাটিটা ভূমি হইতে তুলিয়া কপালে আঘাত করিতে লাগিল, কপাল ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল।

তখন বলিল "এই দেখ, আমি বাঁচিয়া আছি!"

শারদাশঙ্কর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন—খোকা ভয়ে বাবাকে ডাকিতে লাগিল, দুই মূর্চ্ছিতা রমণী মাটিতে পড়িয়া রহিল!

তখন কাদম্বিনী "ওগো আমি মরি নাই গো মরি নাই গো মরি নাই"—বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। শারদাশঙ্কর উপরের ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন ঝপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল।

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে—মধ্যাহ্নেও বৃষ্টির বিরাম নাই। কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।

মুক্তির উপায়।

১

ফকিরচাঁদ বাল্যকাল হইতেই গম্ভীরপ্রকৃতি। বৃদ্ধসমাজে তাহকে কথনই বেমানান্ দেথাইত না। ঠাণ্ডা জল, হিম, এবং হাস্য পরিহাস তাহার একেবারে সহ্য হইত না। একে গম্ভীর তাহাতে বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই মুথমণ্ডলের চারিদিকে কালো পশমের গলাবন্ধ জড়াইয়া থাকাতে তাহাকে ভয়ঙ্কর উঁচুদরের লোক বলিয়া বোধ হইত। ইহার উপরে, অতি অল্প বয়সেই তাহার ওষ্ঠাধর এবং গণ্ডস্থল প্রচুর গোঁফ দাড়িতে আচ্ছন্ন হওয়াতে সমস্ত মুখের মধ্যে হাস্যবিকাশের স্থান আর তিল মাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

স্ত্রী হৈমবতীর বয়স অল্প এবং তাহার মন পার্থিব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট। সে বঙ্কিম বাবুর নভেল পড়িতে চায় এবং স্বামীকে ঠিক দেবতার ভাবে পূজা করিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না। সে একটুথানি হাসিখুসি ভালবাসে; এবং বিকচোন্মুখ পুষ্প যেমন বায়ুর আন্দোলন এবং প্রভাতের আলোকের জন্য ব্যাকুল হয়, সেও তেমনি এই নব যৌবনের সময় স্বামীর নিকট হইতে আদর এবং হাস্যামোদ যথাপরিমাণে প্রত্যাশা করিয়া থাকে। কিন্তু স্বামী তাহাকে অবসর পাইলেই ভাগবত পড়ায়, সন্ধ্যাবেলায় ভগবদ্গীতা শুনায়, এবং

তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশে মাঝে মাঝে শারীরিক শাসন করিতেও ত্রুটি করে না। যে দিন হৈমবতীর বালিশের নীচে হইতে "কৃষ্ণকান্তের উইল" বাহির হয় সে দিন উক্ত লঘুপ্রকৃতি যুবতীকে সমস্ত রাত্রি অশ্রুপাত করাইয়া তবে ফকির ক্ষান্ত হন। একে নভেল পাঠ তাহাতে আবার পতিদেবকে প্রতারণা! যাহা হউক্ অবিশ্রাম আদেশ অনুদেশ উপদেশ ধর্ম্মনীতি এবং দণ্ডনীতির দ্বারা অবশেষে হৈমবতীর মুখের হাসি, মনের সুখ এবং যৌবনের আবেগ একেবারে নিষ্কর্ষণ করিয়া ফেলিতে স্বামীদেবতা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু, অনাসক্ত লোকের পক্ষে সংসারে বিস্তর বিঘ্ন। পরে পরে ফকিরের এক ছেলে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারবন্ধন বাড়িয়া গেল। পিতার তাড়নায় এতবড় গম্ভীরপ্রকৃতি ফকিরকেও আপিসে আপিসে কর্ম্মের উমেদারীতে বাহির হইতে হইল, কিন্তু কর্ম্ম জুটিবার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তখন তিনি মনে করিলেন বুদ্ধদেবের মত আমি সংসার ত্যাগ করিব। এই ভাবিয়া একদিন গভীর রাত্রে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

২

মধ্যে আর একটি ইতিহাস বলা আবশ্যক।

নবগ্রামবাসী ষষ্ঠিচরণের এক ছেলে। নাম মাখনলাল।

বিবাহের অনতিবিলম্বে সন্তানাদি না হওয়াতে পিতার অনু-রোধে এবং নূতনত্বের প্রলোভনে আর একটি বিবাহ করেন। এই বিবাহের পর হইতে যথাক্রমে তাঁহার উভয় স্ত্রীর গর্ভে সাতটি কন্যা এবং একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

মাখন লোকটা নিতান্ত সৌখীন এবং চপল প্রকৃতি, কোন প্রকার গুরুতর কর্ত্তব্যের দ্বারা আবদ্ধ হইতে নিতান্ত নারাজ। একে ত ছেলেপুলের ভার, তাহার পরে যখন দুই কর্ণধার দুই কর্ণে ঝিঁকা মারিতে লাগিল তখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া সেও একদিন গভীর রাত্রে ডুব মারিল।

বহুকাল তাহার আর সাক্ষাৎ নাই। কখন কখন শুনা যায়, এক বিবাহে কিরূপ সুখ তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য সে কাশীতে গিয়া গোপনে আর একটি বিবাহ করিয়াছে; শুনা যায়, হতভাগ্য কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়াছে। কেবল দেশের কাছাকাছি আসিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার মন উতলা হয়, ধরা পড়িবার ভয়ে আসিতে পারে না।

৩

কিছু দিন ঘুরিতে ঘুরিতে উদাসীন ফকিরচাঁদ নবগ্রামে আসিয়া উপস্থিত। পথপার্শ্ববর্ত্তী এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "আহা, বৈরাগ্যমেবাভয়ং। দারা পুত্র ধন জন কেউ কারো নয়। কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ।" বলিয়া এক গান জুড়িয়া দিলেন।

শোন্‌রে শোন্‌, অবোধ মন!
শোন্‌ সাধুর উক্তি কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর্‌ গ্রহণ!
ভবের শুক্তি ভেঙ্গে মুক্তি-মুক্তা কর অন্বেষণ!
ওরে ও ভোলা মন, ভোলা মন রে!

সহসা গান বন্ধ হইয়া গেল। "ও কে ও! বাবা দেখ্‌চি! সন্ধান পেয়েছেন বুঝি! তবেই ত সর্ব্বনাশ! আবার ত সংসারের অন্ধকূপে টেনে নিয়ে যাবেন! পালাতে হল।"

৪

ফকির তাড়াতাড়ি নিকটবর্ত্তী এক গৃহে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ গৃহস্বামী চুপ্‌চাপ্‌ বসিয়া তামাক টানিতেছিল। ফকিরকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেহে তুমি?"

ফকির। বাবা, আমি সন্ন্যাসী।

বৃদ্ধ। সন্ন্যাসী! দেখি দেখি বাবা, আলোতে এস দেখি! এই বলিয়া আলোতে টানিয়া লইয়া ফকিরের মুখের পরে ঝুঁকিয়া বুড়া মানুষ বহু কষ্টে যেমন করিয়া পুঁথি পড়ে তেমনি করিয়া ফকিরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিড়্‌ বিড়্‌ করিয়া বকিতে লাগিল।

"এই ত আমার সেই মাখনলাল দেখ্‌চি! সেই নাক, সেই চোখ, কেবল কপালটা বদ্‌লেচে, আর সেই চাঁদমুখ গোঁফে দাড়িতে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেচে!" বলিয়া

বৃদ্ধ সস্নেহে ফকিরের শ্মশ্রুল মুখে দুই একবার হাত বুলাইয়া লইল, এবং প্রকাশ্যে কহিল "বাবা, মাখন!"

বলা বাহুল্য বৃদ্ধের নাম ষষ্ঠিচরণ।

ফকির। (সবিস্ময়ে) মাখন! আমার নাম ত মাখন নয়! পূর্ব্বে আমার নাম যাই থাক্, এখন আমার নাম চিদানন্দ স্বামী। ইচ্ছা হয় ত পরমানন্দও বল্‌তে পার।

ষষ্ঠি। বাবা, তা এখন আপনাকে চিঁড়েই বল আর পরমান্নই বল, তুই যে আমার মাখন, বাবা সে ত আমি ভুল্‌তে পারব না!—বাবা, তুই কোন্ দুঃখে সংসার ছেড়ে গেলি! তোর কিসের অভাব! দুই স্ত্রী; বড়টিকে না ভাল বাসিস্ ছোটটি আছে। ছেলে পিলের দুঃখও নেই। শত্রুর মুহে ছাই দিয়ে সাতটি কন্যে, একটি ছেলে। আর আমি বুড়ো বাপ ক'দিনই বা বাঁচব, তোর সংসার তোরই থাকিবে!

ফকির একেবারে আঁৎকিয়া উঠিয়া কহিল "কি সর্ব্বনাশ! শুন্‌লেও যে ভয় হয়!"

এতক্ষণে প্রকৃত ব্যাপারটা বোধগম্য হইল। ভাবিল, মন্দ কি, দিন দুই বৃদ্ধের পুত্রভাবেই এখানে লুকাইয়া থাকা যাক্, তাহার পরে সন্ধানে অকৃতকার্য্য হইয়া বাপ চলিয়া গেলেই এখান হইতে পলায়ন করিব।

ফকিরের নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধের মনে আর সংশয় রহিল না। কেষ্টা চাকরকে ডাকিয়া বলিল "ওরে ও কেষ্টা, তুই সকলকে খবর দিয়ে আয়গে, আমার মাখন ফিরে এসেছে।"

৫

দেখিতে দেখিতে লোকে লোকারণ্য। পাড়ার লোকে অধিকাংশই বলিল সেই বটে, কেহ বা সন্দেহ প্রকাশ করিল। কিন্তু বিশ্বাস করিবার জন্যই লোকে এত ব্যগ্র, যে, সন্দিগ্ধ লোকদের উপরে সকলে হাড়ে চটিয়া গেল। যেন তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক কেবল রসভঙ্গ করিতে আসিয়াছে; যেন তাহারা পাড়ার চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারকে সতের অক্ষর করিয়া বসিয়া আছে, কোন মতে তাহাদিগকে সংক্ষেপ করিতে পারিলেই তবে পাড়াশুদ্ধ লোক আরাম পায়; তাহারা ভূতও বিশ্বাস করে না, ওঝাও বিশ্বাস করে না, আশ্চর্য্য গল্প শুনিয়া যখন সকলের তাক্ লাগিয়া গিয়াছে তখন তাহারা প্রশ্ন উত্থাপন করে। একপ্রকার নাস্তিক বলিলেই হয়। কিন্তু ভূত অবিশ্বাস করিলে ততটা ক্ষতি নাই, তাই বলিয়া বুড়া বাপের হারা ছেলেকে অবিশ্বাস করা যে নিতান্ত হৃদয়-হীনতার কাজ। যাহা হউক্, সকলের নিকট হইতে তাড়না খাইয়া সংশয়ীর দল থামিয়া গেল।

ফকিরের অতি ভীষণ অটল গাম্ভীর্য্যের প্রতি ভ্রূপেক্ষমাত্র না করিয়া পাড়ার লোকেরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল—“আরে আরে, আমাদের সেই মাখন আজ ঋষি হয়েচেন, তপিস্বি হয়েচেন! চিরটা কাল ইয়ার্কি দিয়ে কাটালে আজ হঠাৎ মহামুনি জামদগ্নি হয়ে বসেচেন।”

কথাটা উন্নতচেতা ফকিরের অত্যন্ত খারাপ লাগিল,

কিন্তু নিরুপায়ে সহ্য করিতে হইল। একজন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল "ওরে মাখন, তুই কুচ্‌কুচে কালো ছিলি রংটা এমন ফর্সা করলি কি করে'?"

ফকির উত্তর দিল "যোগ অভ্যাস করে'।"

সকলেই বলিল "যোগের কি আশ্চর্য্য প্রভাব!"

একজন উত্তর করিল "আশ্চর্য্য আর কি! শাস্ত্রে আছে, ভীম যখন হনুমানের লেজ ধরে তুল্‌তে গেলেন কিছুতেই তুল্‌তে পারলেন না। সে কি করে' হ'ল? সে ত যোগ-বলে!"

এ কথা সকলকেই স্বীকার করিলে হইল।

হেনকালে ষষ্ঠিচরণ আসিয়া ফকিরকে বলিল "বাবা একবার বাড়ির ভিতরে যেতে হচ্চে।"

এ সম্ভাবনাটা ফকিরের মাথায় উদয় হয় নাই—হঠাৎ বজ্রাঘাতের মত মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া, পাড়ার লোকের বিস্তর অন্যায় পরিহাস পরিপাক করিয়া অবশেষে বলিল "বাবা, আমি সন্ন্যাসী হয়েচি আমি অন্তঃপুরে ঢুকতে পারব না।"

ষষ্ঠিচরণ পাড়ার লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিল "তা হ'লে আপনাদের একবার গা তুল্‌তে হচ্চে। বৌমাদের এইখানেই নিয়ে আসি। তাঁরা বড় ব্যাকুল হয়ে আছেন।"

সকলে উঠিয়া গেল। ফকির ভাবিল এইবেলা এখান হইতে এক দৌড় মারি। কিন্তু রাস্তায় বাহির হইলেই

পাড়ার লোক কুক্কুরের মত তাহার পশ্চাতে ছুটিবে ইহাই কল্পনা করিয়া তাহাকে নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিতে হইল।

যেম্‌নি মাখনলালের দুই স্ত্রী প্রবেশ করিল ফকির অম্‌নি নতশিরে তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিল "মা আমি তোমাদের সন্তান!"

অম্‌নি ফকিরের নাকের সম্মুখে একটা বালা-পরা হাত খড়্গের মত খেলিয়া গেল এবং একটি কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল "ওরে ও পোড়াকপালে মিন্সে, তুই মা বল্লি কা'কে!"

অম্‌নি আর একটি কণ্ঠ আরো দুই সুর উচ্চে পাড়া কাঁপাইয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল "চোখের মাথা খেয়ে বসেছিস্ তোর মরণ হয় না!"

নিজের স্ত্রীর নিকট হইতে এরূপ চলিত বাঙ্গলা শোনা অভ্যাস ছিল না সুতরাং একান্ত কাতর হইয়া ফকির যোড়-হস্তে কহিল "আপনারা ভুল বুঝ্‌চেন! আমি এই আলোতে দাঁড়াচ্চি আমাকে একটু ঠাউরে দেখুন!"

প্রথমা ও দ্বিতীয়া পরে পরে কহিল "ঢের দেখেছি! দেখে দেখে চোখ্ ক্ষয়ে' গেছে। তুমি কচি খোকা নও, আজ নতুন জন্মাও নি। তোমার দুধের দাঁত অনেক দিন ভেঙ্গেছে। তোমার কি বয়সের গাছপাথর আছে। তোমায় যম ভুলেচে বলে কি আমরা ভুল্‌ব!"

এরূপ একতরফা দাম্পত্য আলাপ কতক্ষণ চলিত বলা

যায় না—কারণ ফকির একেবারে বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া নত-শিরে দাঁড়াইয়া ছিল। এমন সময় অত্যন্ত কোলাহল শুনিয়া এবং পথে লোক জমিতে দেখিয়া ষষ্ঠিচরণ প্রবেশ করিল।

বলিল "এত দিন আমার ঘর নিস্তব্ধ ছিল, একেবারে টুঁশব্দ ছিল না! আজ মনে হচ্চে বটে আবার মাখন ফিরে এসেচে!"

ফকির করযোড়ে কহিল "মশায়, আপনার পুত্রবধূদের হাত থেকে আমাকে রক্ষে করুন!"

ষষ্ঠি। বাবা, অনেক দিন পরে এসেছ তাই প্রথমটা একটু অসহ্য বোধ হচ্চে। তা, মা, তোমরা এখন যাও! বাবা মাখন ত এখন এখানেই রইলেন; ওঁকে আর কিছুতেই যেতে দিচ্চি নে।

ললনাদ্বয় বিদায় হইলে ফকির ষষ্ঠিচরণকে বলিল "মশায়, আপনার পুত্র কেন যে সংসার ত্যাগ করে' গেছেন তা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারচি। মশায় আমার প্রণাম জান্‌বেন, আমি চল্লেম।"

বৃদ্ধ এম্‌নি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন উত্থাপন করিল যে পাড়ার লোক মনে করিল মাখন তাহার বাপকে মারিয়াছে। তাহারা হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। সকলে আসিয়া ফকিরকে জানাইয়া দিল এমন ভণ্ডতপস্বিগিরি এখানে খাটিবে না। ভালমানুষের ছেলের মত কাল কাটাইতে হইবে। একজন বলিল "ইনি ত পরমহংস নন্‌ পরম বক।"

গাম্ভীর্য্য গোঁফদাড়ি এবং গলাবন্ধের জোরে ফকিরকে এমন সকল কুৎসিত কথা কখন শুনিতে হয় নাই। যাহা হউক্ লোকটা পাছে আবার পালায় পাড়ার লোকেরা অত্যন্ত সতর্ক রহিল। স্বয়ং জমিদার ষষ্ঠিচরণের পক্ষ অবলম্বন করিল।

৬

ফকির দেখিল এম্‌নি কড়া পাহারা যে, মৃত্যু না হইলে ইহারা ঘরের বাহির করিবে না। একাকী ঘরে বসিয়া গান গাহিতে লাগিল—

শোন্ সাধুর উক্তি কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ।

বলা বাহুল্য, গানটার আধ্যাত্মিক অর্থ অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।

এমন করিয়াও কোনমতে দিন কাটিত। কিন্তু মাখনের আগমন সংবাদ পাইয়া দুই স্ত্রীর সম্পর্কের এক ঝাঁক শ্যালা ও শ্যালী আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহারা আসিয়াই প্রথমতঃ ফকিরের গোঁফ দাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল—তাহারা বলিল এ ত সত্যকার গোঁফ দাড়ি নয়, ছদ্মবেশ করিবার জন্য আঠা দিয়া জুড়িয়া আসিয়াছে।

নাসিকার নিম্নবর্ত্তী গুম্ফ ধরিয়া টানাটানি করিলে ফকিরের ন্যায় অত্যন্ত মহৎ লোকেরও মাহাত্ম্য রক্ষা করা

দুষ্কর হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া কানের উপর উপদ্রবও ছিল; প্রথমতঃ মলিয়া, দ্বিতীয়তঃ এমন সকল ভাষা প্রয়োগ করিয়া যাহাতে কান না মলিলেও, কান লাল হইয়া উঠে।

ইহার পর ফকিরকে তাহারা এমন সকল গান ফর্‌মায়েস্ করিতে লাগিল, আধুনিক বড় বড় নূতন পণ্ডিতেরা যাহার কোনরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে হার মানেন। আবার নিদ্রাকালে তাহারা ফকিরের স্বল্পাবশিষ্ট গণ্ডস্থলে চুনকালী মাথাইয়া দিল, আহারকালে কেসুরের পরিবর্ত্তে কচু, ডাবের জলের পরিবর্ত্তে হুঁকার জল, দুধের পরিবর্ত্তে পিঠালি গোলার অয়োজন করিল, পিঁড়ার নীচে সুপারি রাখিয়া তাহাকে আছাড় খাওয়াইল, লেজ বানাইল এবং সহস্র প্রচলিত উপায়ে ফকিরের অভ্রভেদী গাম্ভীর্য্য ভূমিসাৎ করিয়া দিল।

ফকির রাগিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ঝাঁকিয়া হাঁকিয়া কিছুতেই উপদ্রবকারীদের মনে ভীতির সঞ্চার করিতে পারিল না। কেবল সর্ব্বসাধারণের নিকট অধিকতর হাস্যাস্পদ হইতে লাগিল। ইহার উপরে আবার অন্তরাল হইতে একটি মিষ্ট কণ্ঠের উচ্চহাস্য মাঝে মাঝে কর্ণগোচর হইত; সেটা যেন পরিচিত বলিয়া ঠেকিত এবং মন দ্বিগুণ অধৈর্য্য হইয়া উঠিত।

পরিচিত কণ্ঠ পাঠকের অপরিচিত নহে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ষষ্ঠীচরণ কোন এক সম্পর্কে হৈমবতীর মামা। বিবাহের পর শাশুড়ির দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত

হইয়া পিতৃমাতৃহীনা হৈমবতী মাঝে মাঝে কোন-না-কোন কুটুম্ব বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিত। অনেক দিন পরে সে মামার বাড়ি আসিয়া নেপথ্য হইতে এক পরম কৌতুকাবহ অভিনয় নিরীক্ষণ করিতেছে। তৎকালে হৈমবতীর স্বাভাবিক রঙ্গপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছিল কি না চরিত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্থির করিবেন, আমরা বলিতে অক্ষম।

ঠাট্টার সম্পর্কীয় লোকেরা মাঝে মাছে বিশ্রাম করিত কিন্তু স্নেহের সম্পর্কীয় লোকদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। সাত মেয়ে এবং এক ছেলে তাঁহাকে একদণ্ড ছাড়ে না। বাপের স্নেহ অধিকার করিবার জন্য তাহাদের মা তাহাদিগকে অনুক্ষণ নিযুক্ত রাখিয়াছিল। দুই মাতার মধ্যে আবার রেষারেষি ছিল উভয়েরই চেষ্টা যাহাতে নিজের সন্তানই অধিক আদর পায়। উভয়েই নিজ নিজ সন্তানদিগকে সর্ব্বদাই উত্তেজিত করিতে লাগিল—দুই দলে মিলিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরা, কোলে বসা, মুখ চুম্বন করা প্রভৃতি প্রবল স্নেহব্যক্তি কার্য্যে পরস্পরকে জিতিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য ফকির লোকটা অত্যন্ত নির্লিপ্ত স্বভাব, নহিলে নিজের সন্তানদের অকাতরে ফেলিয়া আসিতে পারিত না; শিশুরা ভক্তি করিতে জানে না, তাহারা সাধুত্বের নিকট অভিভূত হইতে শিখে নাই, এই জন্য

ফকির শিশুজাতির প্রতি তিলমাত্র অনুরক্ত ছিল না, তাহা-দিগকে তিনি কীট পতঙ্গের ন্যায় দেহ হইতে দূরে রাখিতে ইচ্ছা করিতেন। সম্প্রতি তিনি অহরহ শিশুপঙ্গপালে আচ্ছন্ন হইয়া বর্জ্জইস্ অক্ষরের ছোট বড় নোটের দ্বারা আদ্যো-পান্ত সমাকীর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ন্যায় শোভমান হইলেন। তাহাদের মধ্যে বয়সের বিস্তর তারতম্য ছিল, এবং তাহারা সকলেই কিছু তাঁহার সহিত বয়ঃপ্রাপ্ত সভ্যজনোচিত ব্যবহার করিত না; শুদ্ধশুচি ফকিরের চক্ষে অনেক সময় অশ্রুর সঞ্চার হইত এবং তাহা আনন্দাশ্রু নহে।

পরের ছেলেরা যখন নানা স্বরে তাঁহাকে বাবা বাবা করিয়া ডাকিয়া আদর করিত, তখন তাঁহার সাংঘাতিক পাশবশক্তি প্রয়োগ করিবার একান্ত ইচ্ছা হইত কিন্তু ভয়ে পারিতেন না। মুখ চক্ষু বিকৃত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

৭

অবশেষে ফকির মহা চেঁচামেচি করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি যাবই, দেখি আমাকে কে আটক করিতে পারে!"

তখন গ্রামের লোক এক উকীল আনিয়া উপস্থিত করিল। উকীল আসিয়া কহিল "জানেন আপনার দুই স্ত্রী।"

ফকির। আজ্ঞে এখানে এসে প্রথম জান্‌লুম।

উকীল। আর আপনার সাত মেয়ে এক ছেলে, তার মধ্যে দুটি মেয়ে বিবাহযোগ্যা।

ফকির। আজ্ঞে, আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশি জানেন দেখতে পাচ্ছি।

উকীল। আপনার এই বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের ভার আপনি যদি না নেন্ তবে আপনার অনাথিনী দুই স্ত্রী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, পূর্ব্বে হ'তে বলে' রাখলুম।

ফকির সব চেয়ে আদালতকে ভয় করিত। তাহার জানা ছিল উকীলরা জেরা করিবার সময় মহাপুরুষদিগের মান-মর্য্যাদা গাম্ভীর্য্যকে খাতির করে না—প্রকাশ্যে অপমান করে এবং খবরের কাগজে তাহার রিপোর্ট্ বাহির হয়; ফকির অশ্রুসিক্ত লোচনে উকীলকে বিস্তারিত আত্মপরিচয় দিতে চেষ্টা করিল—উকীল তাহার চাতুরীর, তাহার উপস্থিত বুদ্ধির, তাহার মিথ্যা গল্প রচনার অসাধারণ ক্ষমতার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল। শুনিয়া ফকিরের আপন হস্ত পদ দংশন করিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

ষষ্ঠিচরণ ফকিরকে পুনশ্চ পলায়নোদ্যত দেখিয়া শোকে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল। পাড়ার লোকে তাহাকে চারি-দিকে ঘিরিয়া অজস্র গালি দিতে লাগিল, এবং উকীল তাহাকে এমন শাসাইল যে তাহার মুখে আর কথা রহিল না।

ইহার উপর যখন আটজন বালক বালিকা গাঢ় স্নেহে তাহাকে চারিদিকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া তাহার শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিল তখন অন্তরালস্থিত হৈমবতী হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না।

ফকির অন্য উপায় না দেখিয়া ইতিমধ্যে নিজের পিতাকে একখানা চিঠি লিখিয়া সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিয়াছিল। সেই পত্র পাইয়া ফকিরের পিতা হরিচরণ বাবু আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু, পাড়ার লোক, জমিদার এবং উকীল কিছু-তেই দখল ছাড়ে না!

এ লোকটি যে ফকির নহে মাখন, তাহারা তাহার সহস্র অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করিল—এমন কি, যে ধাত্রী মাখনকে মানুষ করিয়াছিল সেই বুড়ীকে আনিয়া হাজির করিল। সে কম্পিত হস্তে ফকিরের চিবুক তুলিয়া ধরিয়া মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার দাড়ির উপরে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

যখন দেখিল, তাহাতেও ফকির রাশ মানে না, তখন ঘোমটা টানিয়া দুই স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। পাড়ার লোকেরা শশব্যস্ত হইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। কেবল দুই বাপ, ফকির, এবং শিশুরা ঘরে রহিল।

দুই স্ত্রী হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিল "কোন্ চুলোয় যমের কোন্ দুয়োরে যাবার ইচ্ছে হয়েচে?"

ফকির তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না সুতরাং নিরুত্তর হইয়া রহিল। কিন্তু ভাবে যেরূপ প্রকাশ পাইল তাহাতে যমের কোন বিশেষ দ্বারের প্রতি তাহার যে বিশেষ পক্ষপাত আছে এরূপ বোধ হইল না; আপাততঃ যে কোন একটা দ্বার পাইলেই সে বাঁচে, কেবল একবার বাহিরিতে পরিলেই হয়।

তখন আর একটি রমণীমূর্ত্তি গৃহে প্রবেশ করিয়া ফকিরকে প্রণাম করিল।

ফকির প্রথমে অবাক্ তাহার পরে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিল "এ যে হৈমবতী!"

নিজের অথবা পরের স্ত্রীকে দেখিয়া এত প্রেম তাহার চক্ষে ইতিপূর্ব্বে কখন প্রকাশ পায় নাই। মনে হইল মূর্ত্তি-মতী মুক্তি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

পরিশিষ্ট।

আর একটি লোক মুখের উপর শালমুড়ি দিয়া অন্তরাল হইতে দেখিতেছিল। তাহার নাম মাখনলাল। একটি অপরি-চিত নিরীহ ব্যক্তিকে নিজপদে অভিষিক্ত দেখিয়া সে এত-ক্ষণ পরম সুখানুভব করিতেছিল। অবশেষে যখন হৈম-বতীকে উপস্থিত দেখিয়া বুঝিতে পারিল উক্ত নিরপরাধী ব্যক্তি তাহার নিজের ভগ্নীপতি, তখন দয়াপরতন্ত্র হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল—না, আপনার লোককে এমন বিপদে ফেলা মহাপাতক। দুই স্ত্রীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, এ আমারি দড়ি, আমারি কলসী।

মাখনলালের এই অসাধারণ মহত্ত্ব ও বীরত্বে পাড়ার লোক আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সুভা।

১।

মেয়েটির নাম যখন সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জানিত সে বোবা হইবে? তাহার দুটি বড় বোনকে সুকেশিনী ও সুহাসিনী নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাই মিলের অনুরোধে তাহার বাপ ছোট মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখে। এখন সকলে তাহাকে সংক্ষেপে সুভা বলে।

দস্তুরমত অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ে বড় দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে, এখন ছোটটি পিতামাতার নীরব হৃদয়ভারের মত বিরাজ করিতেছে।

যে কথা কয় না, সে যে কিছু অনুভব করে, ইহা সকলের মনে হয় না, এই জন্য তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। সে যে, বিধাতার অভিশাপস্বরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এ কথা সে শিশুকাল হইতে বুঝিয়া লইয়াছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল, সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিত। মনে করিত, আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি। কিন্তু বেদনা কি কেহ কখন ভোলে? পিতামাতার মনে সে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল।

বিশেষতঃ তাহার মা তাহাকে নিজের একটা ত্রুটিস্বরূপে দেখিতেন। কেন না, মাতা পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে নিজের অংশস্বরূপে দেখেন—কন্যার কোন অসম্পূর্ণতা দেখিলে সেটা যেন বিশেষরূপে নিজের লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করেন। বরঞ্চ কন্যার পিতা বাণীকণ্ঠ সুভাকে তাঁহার অন্য মেয়ের অপেক্ষা যেন একটু বেশী ভালবাসিতেন, কিন্তু মাতা তাহাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি বড় বিরক্ত ছিলেন।

সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড় বড় দুটি কালো চোখ ছিল—এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলয়ের মত কাঁপিয়া উঠিত।

কথায় আমরা যে ভাব প্রকাশ করি, সেটা আমাদিগকে অনেকটা নিজের চেষ্টায় গড়িয়া লইতে হয়, কতকটা তর্জ্জমা করার মত ; সকল সময়ে ঠিক হয় না, ক্ষমতা অভাবে অনেক সময়ে ভুলও হয়। কিন্তু কালো চোখকে কিছু তর্জ্জমা করিতে হয় না—মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে ; ভাব আপনি তাহার উপরে কখন প্রসারিত, কখন মুদিত হয়, কখন উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখন ম্লানভাবে নিবিয়া আসে, কখন অস্তমান চন্দ্রের মত অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে, কখন দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মত দিগ্বিদিকে ঠিকরিয়া উঠে। মুখের ভাব বই আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নাই, তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর,

অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মত, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি। এই বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মত একটা বিজন মহত্ত্ব আছে। এইজন্য সাধারণ বালক-বালিকারা তাহাকে একপ্রকার ভয় করিত, তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জ্জন দ্বিপ্রহরের মত শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন।

২।

গ্রামের নাম চণ্ডিপুর। নদীটি বাঙ্গলা দেশের একটি ছোট নদী, গৃহস্থ ঘরের মেয়েটির মত; বহুদূরপর্য্যন্ত তাহার প্রসর নহে; নিরলসা তন্বী নদীটি আপন কূল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায়; দুই ধারের গ্রামের সকলেরই সঙ্গে তাহার যেন একটা-না-একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালয় এবং তরুচ্ছায়াঘন উচ্চতট; নিম্নতল দিয়া গ্রাম-লক্ষ্মী স্রোতস্বিনী আত্মবিস্মৃত দ্রুত পদক্ষেপে, প্রফুল্লহৃদয়ে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্য্যে চলিয়াছে।

বাণীকণ্ঠের ঘর নদীর একেবারে উপরেই। তাহার বাখারির বেড়া, আটচালা, গোয়ালঘর, ঢেঁকিশালা, খড়ের স্তূপ, তেঁতুলতলা, আম কাঁঠাল এবং কলার বাগান, নৌকাবাহী-মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গার্হস্থ্য স্বচ্ছলতার মধ্যে বোবা মেয়েটি কাহারও নজরে পড়ে কি না জানি না, কিন্তু কাজকর্ম্মে যখনি অবসর পায় তখনি সে এই নদীতীরে আসিয়া বসে।

প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখীর ডাক, তরুর মর্ম্মর সমস্ত মিশিয়া চারিদিকের চলাফেরা আন্দোলন কম্পনের সহিত এক হইয়া, সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায়, বালিকার চির-নিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি ইহাও বোবার ভাষা—বড় বড় চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যে ভাষা, তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গী, সঙ্গীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।

এবং মধ্যাহ্নে যখন মাঝিরা জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহস্থেরা ঘুমাইত, পাখীরা ডাকিত না, খেয়া নৌকা বন্ধ থাকিত, সজন জগৎ সমস্ত কাজকর্ম্মের মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া ভয়ানক বিজন মূর্ত্তি ধারণ করিত, তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত—একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে আর একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।

সুভার যে গুটিকতক অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিল না তাহা নহে। গোয়ালের দুটি গাভী, তাহাদের নাম সর্ব্বশী ও পাঙ্গুলি। সে নাম বালিকার মুখে তাহারা কখন শুনে নাই, কিন্তু তাহার পদশব্দ তাহারা চিনিত—তাহার কথাহীন একটা

করুণ স্বর ছিল, তাহার মর্ম্ম তাহারা ভাষার অপেক্ষা সহজে বুঝিত। সুভা কখন্ তাহাদের আদর করিতেছে, কখন্ ভৎর্সনা করিতেছে, কখন্ মিনতি করিতেছে, তাহা তাহারা মানুষের অপেক্ষা ভাল বুঝিতে পারিত।

সুভা গোয়ালে ঢুকিয়া দুই বাহুর দ্বারা সর্ব্বশীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া তাহার কানের কাছে আপনার গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করিত এবং পাঙ্গুলি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গা চাটিত। বালিকা দিনের মধ্যে নিয়মিত তিনবার করিয়া গোয়ালঘরে যাইত, তাহা ছাড়া অনিয়মিত আগমনও ছিল; গৃহে যেদিন কোন কঠিন কথা শুনিত, সেদিন সে অসময়ে তাহার এই মূক বন্ধু দুটির কাছে আসিত—তাহার সহিষ্ণুতাপরিপূর্ণ বিষাদশান্ত দৃষ্টিপাত হইতে তাহারা কি একটা অন্ধ অনুমানশক্তি দ্বারা বালিকার মর্ম্মবেদনা যেন বুঝিতে পারিত, এবং সুভার গা ঘেঁসিয়া আসিয়া অল্পে অল্পে তাহার বাহুতে শিং ঘষিয়া ঘষিয়া তাহাকে নির্ব্বাক্ ব্যাকুলতার সহিত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিত।

ইহারা ছাড়া ছাগল এবং বিড়ালশাবকও ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত সুভার এরূপ সমকক্ষ ভাবের মৈত্রী ছিল না, তথাপি তাহারা যথেষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করিত। বিড়ালশিশুটি দিনে এবং রাত্রে যখন্ তখন্ সুভার গরম কোলটি নিঃসঙ্কোচে অধিকার করিয়া সুখনিদ্রার আয়োজন করিত এবং সুভা তাহার গ্রীবা ও পৃষ্ঠে কোমল অঙ্গুলি বুলাইয়া

দিলে, যে, তাহার নিদ্রাকর্ষণের বিশেষ সহায়তা হয়, ইঙ্গিতে এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিত।

৩।

উন্নত-শ্রেণীর জীবের মধ্যে সুভার আরো একটি সঙ্গী জুটিয়াছিল, কিন্তু তাহার সহিত বালিকার ঠিক কিরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ, সে ভাষাবিশিষ্ট জীব; সুতরাং উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না।

গোঁসাইদের ছোট ছেলেটি—তাহার নাম প্রতাপ। লোকটি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। সে যে, কাজকর্ম্ম করিয়া সংসারের উন্নতি করিতে যত্ন করিবে বহু চেষ্টার পর বাপ মা সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন। অকর্ম্মণ্য লোকের একটা সুবিধা এই যে, আত্মীয় লোকেরা তাহাদের উপর বিরক্ত হয় বটে, কিন্তু প্রায় তাহারা নিঃসম্পর্ক লোকদের প্রিয়পাত্র হয়—কারণ, কোন কার্য্যে আবদ্ধ না থাকাতে তাহারা সরকারী সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। সহরে যেমন এক-আধটা গৃহসম্পর্কহীন সরকারী বাগান থাকা আবশ্যক, তেমনি গ্রামে দুই চারটা অকর্ম্মণ্য সরকারী লোক থাকার বিশেষ প্রয়োজন। কাজেকর্ম্মে, আমোদ অবসরে যেখানে একটা লোক কম পড়ে, সেখানেই তাহাদিগকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

প্রতাপের প্রধান সখ, ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা। ইহাতে অনেকটা সময় সহজে কাটান' যায়। অপরাহ্নে নদীতীরে ইহাকে প্রায় এই কাজে নিযুক্ত দেখা যাইত। এবং এই উপ-

লক্ষে সুভার সহিত তাহার প্রায় সাক্ষাৎ হইত। যে কোন কাজেই নিযুক্ত থাক্, একটা সঙ্গী পাইলে প্রতাপ থাকে ভাল। মাছধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্ব্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এইজন্য প্রতাপ সুভার মর্য্যাদা বুঝিত। এইজন্য, সকলেই সুভাকে সুভা বলিত, প্রতাপ আর একটু অতিরিক্ত আদর সংযোগ করিয়া সুভাকে 'সু' বলিয়া ডাকিত।

সুভা তেঁতুলতলায় বসিয়া থাকিত এবং প্রতাপ অনতিদূরে মাটিতে ছিপ্ ফেলিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকিত। প্রতাপের একটি করিয়া পান বরাদ্দ ছিল, সুভা তাহা নিজে সাজিয়া আনিত। এবং বোধ করি, অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চাহিয়া চাহিয়া ইচ্ছা করিত প্রতাপের কোন একটা বিশেষ সাহায্য করিতে, একটা কোন কাজে লাগিতে, কোন মতে জানাইয়া দিতে, যে, এই পৃথিবীতে সেও একজন কম প্রয়োজনীয় লোক নহে। কিন্তু কিছুই করিবার ছিল না। তখন সে মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করিত—মন্ত্রবলে সহসা এমন একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটাইতে ইচ্ছা করিত যাহা দেখিয়া প্রতাপ আশ্চর্য্য হইয়া যাইত, বলিত, তাইত, আমাদের সুভির যে এত ক্ষমতা তাহা ত জানিতাম না!"

মনে কর, সুভা যদি জলকুমারী হইত; আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রাখিয়া যাইত; প্রতাপ তাহার তুচ্ছ মাছধরা রাখিয়া সেই মাণিক

লইয়া জলে ডুব মারিত ; এবং পাতালে গিয়া দেখিত, রূপার অট্টালিকায় সোনার পালঙ্কে—কে বসিয়া ?—আমাদের বাণী-কণ্ঠের ঘরের সেই বোবা মেয়ে সু—আমাদের সু সেই মণি-দীপ্ত গভীর নিস্তব্ধ পাতালপুরীর একমাত্র রাজকন্যা। তাহা কি হইতে পারিত না, তাহা কি এতই অসম্ভব! আসলে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তবুও সু প্রজাশূন্য পাতালের রাজ-বংশে না জন্মিয়া বাণীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে, এবং গোঁসাইদের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য্য করিতে পারিতেছে না।

৪।

সুভার বয়স ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমে সে যেন আপ-নাকে আপনি অনুভব করিতে পারিতেছে। যেন কোন একটা পূর্ণিমা তিথিতে কোন একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোত আসিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে এক নূতন অনির্ব্বচনীয় চেতনা-শক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, প্রশ্ন করি-তেছে এবং বুঝিতে পারিতেছে না।

গভীর পূর্ণিমা রাত্রে সে একদিন ধীরে শয়ন-গৃহের দ্বার খুলিয়া ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে। পূর্ণিমা প্রকৃতিও সুভার মত একাকিনী সুপ্ত জগ-তের উপর জাগিয়া বসিয়া—যৌবনের রহস্যে, পুলকে বিষাদে, অসীম নির্জ্জনতার একেবারে শেষ সীমা পর্য্যন্ত, এমন কি,

তাহা অতিক্রম করিয়াও থম্‌থম্‌ করিতেছে, একটি কথা কহিতে পারিতেছে না। এই নিস্তব্ধ ব্যাকুল প্রকৃতির প্রান্তে একটি নিস্তব্ধ ব্যাকুল বালিকা দাঁড়াইয়া।

এদিকে কন্যাভারগ্রস্ত পিতামাতা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছে। লোকেও নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে। এমন কি, একঘরে করিবে এমন জনরবও শুনা যায়। বাণীকণ্ঠের স্বচ্ছল অবস্থা, দুই বেলাই মাছ ভাত খায়, এজন্য তাহার শত্রু ছিল।

স্ত্রীপুরুষে বিস্তর পরামর্শ হইল। কিছুদিনের মত বাণী বিদেশে গেল।

অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া কহিল "চল, কলিকাতায় চল।"

বিদেশযাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। কুয়াশা-ঢাকা প্রভাতের মত সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে একেবারে ভরিয়া গেল। একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কাবশে সে কিছুদিন হইতে ক্রমাগত নির্ব্বাক জন্তুর মত তাহার বাপমায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত—ডাগর চক্ষু মেলিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কি একটা বুঝিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাঁহারা কিছু বুঝাইয়া বলিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন অপরাহ্নে জলে ছিপ্‌ ফেলিয়া প্রতাপ হাসিয়া কহিল, "কিরে, সু, তোর না কি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে কর্‌তে যাচ্চিস্‌? দেখিস্‌, আমাদের ভুলিস্‌ নে।" বলিয়া আবার মাছের দিকে মনোযোগ করিল।

মর্ম্মবিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, নীরবে বলিতে থাকে "আমি তোমার কাছে কি দোষ করিয়াছিলাম," সুভা তেমনি করিয়া প্রতাপের দিকে চাহিল; সেদিন গাছের তলায় আর বসিল না; বাণীকণ্ঠ নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয়ন-গৃহে তামাক খাইতেছিলেন, সুভা তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া বাণীকণ্ঠের শুষ্ক কপোলে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

কাল কলিকাতায় যাইবার দিন স্থির হইয়াছে! সুভা গোয়ালঘরে তাহার বাল্যসঙ্গীদের কাছে বিদায় লইতে গেল, তাহাদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া, গলা ধরিয়া একবার দুই চোখে যত পারে কথা ভরিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিল—দুই নেত্রপল্লব হইতে টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।

সেদিন শুক্ল দ্বাদশীর রাত্রি। সুভা শয়ন-গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে শষ্পশয্যায় লুটাইয়া পড়িল—যেন ধরণীকে, এই প্রকাণ্ড মূক মানবমাতাকে দুই বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে, "তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না, মা, আমার মত দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখ!"

কলিকাতার এক বাসায় সুভার মা একদিন সুভাকে খুব করিয়া সাজাইয়া দিলেন। আঁটিয়া চুল বাঁধিয়া, খোঁপায় জরির ফিতা দিয়া, অলঙ্কারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক

শ্রী যথাসাধ্য বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। সুভার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতেছে, পাছে চোখ ফুলিয়া খারাপ দেখিতে হয় এজন্য তাহার মাতা তাহাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন, কিন্তু অশ্রুজল ভর্ৎসনা মানিল না।

বন্ধু সঙ্গে বর স্বয়ং কনে দেখিতে আসিলেন—কন্যার মাবাপ চিন্তিত, শঙ্কিত শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, যেন দেবতা স্বয়ং নিজের বলির পশু বাছিয়া লইতে আসিয়াছেন। মা নেপথ্য হইতে বিস্তর তর্জ্জন গর্জ্জন শাসন করিয়া বালিকার অশ্রুস্রোত দ্বিগুণ বাড়াইয়া পরীক্ষকের সম্মুখে পাঠাইলেন।

পরীক্ষক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "মন্দ নহে।"

বিশেষতঃ বালিকার ক্রন্দন দেখিয়া বুঝিলেন, ইহার হৃদয় আছে এবং হিসাব করিয়া দেখিলেন, যে হৃদয় আজ বাপ-মায়ের বিচ্ছেদ-সম্ভাবনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই হৃদয় আজ বাদে কাল আমারই ব্যবহারে লাগিতে পারিবে। শুক্তির মুক্তার ন্যায় বালিকার অশ্রুজল কেবল বালিকার মূল্য বাড়াইয়া দিল, তাহার হইয়া আর কোন কথা বলিল না।

পঞ্জিকা মিলাইয়া খুব একটা শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

বোবা মেয়েকে পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বাপ মা দেশে চলিয়া গেল—তাহাদের জাতি ও পরকাল রক্ষা হইল।

বর পশ্চিমে কাজ করে। বিবাহের অনতিবিলম্বে স্ত্রীকে পশ্চিমে লইয়া গেল।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল, নববধূ বোবা। তা কেহ বুঝিল না, সেটা তাহার দোষ নহে। সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই। তাহার দুটি চক্ষু সকল কথাই বলিয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে চারিদিকে চায়—ভাষা পায় না, যাহারা বোবার ভাষা বুঝিত সেই আজন্মপরিচিত মুখগুলি দেখিতে পায় না—বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল—অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ তাহা শুনিতে পাইল না।

এবার তাহার স্বামী চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল।

অনধিকার প্রবেশ।

একদা প্রাতঃকালে পথের ধারে দাঁড়াইয়া এক বালক আর এক বালকের সহিত একটি অসমসাহসিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বাজি রাখিয়াছিল। ঠাকুর বাড়ির মাধবী-বিতান হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে পারিবে কি না ইহাই লইয়া তর্ক। একটি বালক বলিল পারিব, আর একটি বালক বলিল কখনই পারিবে না!

কাজটি শুনিতে সহজ অথচ করিতে কেন সহজ নহে তাহার বৃত্তান্ত আর একটু বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক।

পরলোকগত মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির বিধবা স্ত্রী জয়-কালী দেবী এই রাধানাথ জীউর মন্দিরের অধিকারিণী। অধ্যাপক মহাশয় টোলে যে তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন পত্নীর নিকটে একদিনের জন্যও সে উপাধি স-প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কোন কোন পণ্ডিতের মতে উপাধির সার্থকতা ঘটিয়াছিল, কারণ তর্ক এবং বাক্য সমস্তই তাঁহার পত্নীর অংশে পড়িয়াছিল; তিনি পতিরূপে তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিয়াছিলেন।

সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে জয়কালী অধিক কথা কহিতেন না—কিন্তু অনেক সময় দুটি কথায়, এমন কি, নীরবে অতি বড় প্রবল মুখবেগও বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন।

জয়কালী দীর্ঘাকার, দৃঢ়শরীর, তীক্ষ্ণনাসা, প্রখরবুদ্ধি স্ত্রীলোক। তাঁহার স্বামী বর্ত্তমানে তাঁহাদের দেবত্র সম্পত্তি নষ্ট হইবার যো হইয়াছিল। বিধবা তাহার সমস্ত বাকি বকেয়া আদায়, সীমা সহরদ্দ স্থির এবং বহুকালের বেদখল উদ্ধার করিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাপ্য হইতে কেহ তাঁহাকে এক কড়ি বঞ্চিত করিতে পারিত না।

এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌরুষের অংশ থাকাতে তাঁহার যথার্থ সঙ্গী কেহ ছিল না। স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে ভয় করিত। পরনিন্দা, ছোট কথা বা নাকীকান্না তাঁহার অসহ্য ছিল। পুরুষেরাও তাঁহাকে ভয় করিত; কারণ, পল্লিবাসী ভদ্র পুরুষদের চণ্ডীমণ্ডপগত অগাধ আলস্যকে তিনি এক প্রকার নীরব ঘৃণাপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষের দ্বারা ধিক্কার করিয়া যাইতে পারিতেন যাহা তাঁহাদের স্থূল জড়ত্ব ভেদ করিয়াও অন্তরে প্রবেশ করিত।

প্রবলরূপে ঘৃণা করিবার এবং সে ঘৃণা প্রবলরূপে প্রকাশ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই প্রৌঢ়া বিধবাটির ছিল। বিচারে যাহাকে অপরাধী করিতেন তাহাকে তিনি কথায় এবং বিনা কথায়, ভাবে এবং ভঙ্গীতে একেবারে দগ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন।

পল্লীর সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মে বিপদে সম্পদে তাঁহার নিরলস হস্ত ছিল। সর্ব্বত্রই তিনি নিজের একটি গৌরবের স্থান বিনা-চেষ্টায় অতি সহজেই অধিকার করিয়া লইতেন। যেখানে

তিনি উপস্থিত থাকিতেন সেখানে তিনিই যে, সকলের প্রধানপদে, সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অথবা উপস্থিত কোন ব্যক্তির মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না।

রোগীর সেবায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কিন্তু রোগী তাঁহাকে যমেরই মত ভয় করিত। পথ্য বা নিয়মের লেশমাত্র লঙ্ঘন হইলে তাঁহার ক্রোধানল রোগের তাপ অপেক্ষা রোগীকে অধিক উত্তপ্ত করিয়া তুলিত।

এই দীর্ঘাকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার কঠোর নিয়মদণ্ডের ন্যায় পল্লীর মস্তকের উপর উদ্যত ছিলেন; কেহ তাঁহাকে ভালবাসিতে অথবা অবহেলা করিতে সাহস করিত না। পল্লীর সকলের সঙ্গেই তাঁহার যোগ ছিল অথচ তাঁহার মত অত্যন্ত একাকিনী কেহ ছিল না।

বিধবা নিঃসন্তান ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার গৃহে মানুষ হইত। পুরুষ অভিভাবক-অভাবে তাহাদের যে, কোন প্রকার শাসন ছিল না এবং স্নেহান্ধ পিসিমার আদরে তাহারা যে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল এমন কথা কেহ বলিতে পারিত না। তাহাদের মধ্যে বড়টির বয়স আঠারো হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহার বিবাহের প্রস্তাবও আসিত এবং পরিণয়বন্ধন সম্বন্ধে বালকটির চিত্তও উদাসীন ছিল না। কিন্তু পিসিমা তাহার সেই সুখবাসনায় একদিনের জন্যও প্রশ্রয় দেন নাই। অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় কিশোর নব দম্পতির নব প্রেমোদ্গম দৃশ্য তাঁহার কল্পনায় অত্যন্ত উপভোগ্য মনোরম

বলিয়া প্রতীত হইত না। বরং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিবাহ করিয়া অন্য ভদ্র গৃহস্থের ন্যায় আলস্যভরে ঘরে বসিয়া পত্নীর আদরে প্রতিদিন স্ফীত হইতে থাকিবে এ সম্ভাবনা তাঁহার নিকট নিরতিশয় হেয় বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি কঠিন-ভাবে বলিতেন, পুলিন আগে উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করুক্ তার পরে বধূ ঘরে আনিবে। পিসিমার মুখের সেই কঠোর বাক্যে প্রতিবেশিনীদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

ঠাকুরবাড়িটি জয়কালীর সর্ব্বাপেক্ষা যত্নের ধন ছিল। ঠাকুরের শয়ন বসন স্নানাহারের তিলমাত্র ত্রুটি হইতে পারিত না। পূজক ব্রাহ্মণ দুটি দেবতার অপেক্ষা এই একটি মানবীকে অনেক বেশি ভয় করিত। পূর্ব্বে এক সময় ছিল যখন দেবতার বরাদ্দ দেবতা পুরা পাইতেন না। কারণ, পূজক ঠাকুরের আর একটি পূজার প্রতিমা গোপন মন্দিরে ছিল। তাহার নাম ছিল নিস্তারিণী। গোপনে ঘৃত দুগ্ধ ছানা ময়দার নৈবেদ্য স্বর্গে নরকে ভাগাভাগি হইয়া যাইত। কিন্তু আজ কাল জয়কালীর শাসনে পূজার ষোলোআনা অংশই ঠাকুরের ভোগে আসিতেছে উপদেবতাগণকে অন্যত্র জীবিকার অন্য উপায় অন্বেষণ করিতে হইয়াছে।

বিধবার যত্নে ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার তক্‌তক্ করিতেছে—কোথাও একটি তৃণমাত্র নাই। একপার্শ্বে মঞ্চ অবলম্বন করিয়া মাধবীলতা উঠিয়াছে, তাহার শুষ্কপত্র পড়িবামাত্র জয়কালী তাহা তুলিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন।

ঠাকুরবাড়িতে পারিপাট্য পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইলে বিধবা তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়ার ছেলেরা পূর্ব্বে লুকাচুরি খেলা উপলক্ষ্যে এই প্রাঙ্গণের প্রান্তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং মধ্যে মধ্যে পাড়ার ছাগশিশু আসিয়া মাধবীলতার বল্কলাংশ কিছু কিছু ভক্ষণ করিয়া যাইত। এখন আর সে সুযোগ নাই। পর্ব্বকাল ব্যতীত অন্য দিনে ছেলেরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না এবং ক্ষুধাতুর ছাগশিশুকে দণ্ডাঘাত খাইয়াই দ্বারের নিকট হইতে তারস্বরে আপন অজ-জননীকে আহ্বান করিতে করিতে ফিরিতে হইত।

অনাচারী ব্যক্তি পরমাত্মীয় হইলেও দেবালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না। জয়কালীর একটি যবনকরপক্ক-কুক্কুট মাংসলোলুপ ভগিনীপতি আত্মীয় সন্দর্শন উপলক্ষ্যে গ্রামে উপস্থিত হইয়া মন্দির অঙ্গনে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, জয়কালী তাহাতে ত্বরিত ও তীব্র আপত্তি প্রকাশ করাতে সহোদরা ভগিনীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। এই দেবালয় সম্বন্ধে বিধবার এতই অতিরিক্ত অনাবশ্যক সতর্কতা ছিল যে, সাধারণের নিকট তাহা অনেকটা বাতুলতারূপে প্রতীয়মান হইত।

জয়কালী আর সর্ব্বত্রই কঠিন উন্নত স্বতন্ত্র, কেবল এই মন্দিরের সম্মুখে তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া-

ছিলেন। এই বিগ্রহটির নিকট তিনি একান্তরূপে জননী পত্নী দাসী—ইহার কাছে তিনি সতর্ক, সুকোমল, সুন্দর এবং সম্পূর্ণ অবনম্র। এই প্রস্তরের মন্দির এবং প্রস্তরের মূর্ত্তিটি তাঁহার নিগূঢ় নারীস্বভাবের একমাত্র চরিতার্থতার বিষয় ছিল। ইহাই তাঁহার স্বামী পুত্র তাঁহার সমস্ত সংসার।

ইহা হইতেই পাঠকেরা বুঝিবেন, যে, যে বালকটি মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে মাধবীমঞ্জরী আহরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহার সাহসের সীমা ছিল না। সে জয়কালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নলিন। সে তাহার পিসিমাকে ভাল করিয়াই জানিত তথাপি তাহার দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি শাসনের বশ হয় নাই। যেখানে বিপদ সেখানেই তাহার একটা আকর্ষণ ছিল, এবং যেখানে শাসন সেখানেই লঙ্ঘন করিবার জন্য তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকিত! জনশ্রুতি আছে বাল্যকালে তাহার পিসিমার স্বভাবটিও এইরূপ ছিল।

জয়কালী তখন মাতৃস্নেহমিশ্রিত ভক্তির সহিত ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দালানে বসিয়া একমনে মালা জপিতেছিলেন।

বালকটি নিঃশব্দপদে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মাধবীতলায় দাঁড়াইল। দেখিল নিম্নশাখার ফুলগুলি পূজার জন্য নিঃশেষিত হইয়াছে। তখন অতি ধীরে ধীরে সাবধানে মঞ্চে আরোহণ করিল। উচ্চশাখায় দুটি একটি বিকচোন্মুখ কুঁড়ি দেখিয়া যেমন সে শরীর এবং বাহু প্রসারিত করিয়া তুলিতে যাইবে

অমনি সেই প্রবল চেষ্টার ভরে জীর্ণ মঞ্চ সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আশ্রিত লতা এবং বালক একত্রে ভূমিসাৎ হইল।

জয়কালী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রটির কীর্ত্তি দেখিলেন। সবলে বাহু ধরিয়া তাহাকে মাটি হইতে তুলিলেন। আঘাত তাহার যথেষ্ট লাগিয়াছিল—কিন্তু সে আঘাতকে শাস্তি বলা যায় না, কারণ, তাহা অজ্ঞান জড়ের আঘাত। সেই জন্য পতিত বালকের ব্যথিত দেহে জয়কালীর সজ্ঞান শাস্তি মুহুর্মুহু সবলে বর্ষিত হইতে লাগিল। বালক এক-বিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া নীরবে সহ্য করিল। তখন তাহার পিসিমা তাহাকে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রুদ্ধ করিলেন। তাহার সেদিনকার বৈকালিক আহার নিষিদ্ধ হইল।

আহার বন্ধ হইল শুনিয়া দাসী মোক্ষদা কাতরকণ্ঠে ছলছলনেত্রে বালককে ক্ষমা করিতে অনুনয় করিল। জয়-কালীর হৃদয় গলিল না। ঠাকুরাণীর অজ্ঞাতসারে গোপনে ক্ষুধিত বালককে কেহ যে খাদ্য দিবে বাড়িতে এমন দুঃসাহসিক কেহ ছিল না।

বিধবা মঞ্চসংস্কারের জন্য লোক ডাকিতে পাঠাইয়া পুনর্ব্বার মালাহস্তে দালানে আসিয়া বসিলেন। মোক্ষদা কিছুক্ষণ পরে সভয়ে নিকটে আসিয়া কহিল, ঠাকুরমা, কাকাবাবু ক্ষুধায় কাঁদিতেছেন তাঁহাকে কিছু দুধ আনিয়া দিব কি ?

জয়কালী অবিচলিত মুখে কহিলেন, "না।" মোক্ষদা ফিরিয়া গেল। অদূরবর্ত্তী কুটীরের গৃহ হইতে নলিনের করুণ

ক্রন্দন ক্রমে ক্রোধের গর্জ্জনে পরিণত হইয়া উঠিল—অবশেষে অনেকক্ষণ পরে তাহার কাতরতার শ্রান্ত উচ্ছ্বাস থাকিয়া থাকিয়া জপনিযুক্ত পিসিমার কানে আসিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল।

নলিনের আর্ত্তকণ্ঠ যখন পরিশ্রান্ত ও মৌনপ্রায় হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে আর একটি জীবের ভীত কাতর ধ্বনি নিকটে ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে ধাবমান মনুষ্যের দূরবর্ত্তী চীৎকার শব্দ মিশ্রিত হইয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ পথে একটা তুমুল কলরব উত্থিত হইল।

সহসা প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পদশব্দ শোনা গেল। জয়কালী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন ভূপর্য্যস্ত মাধবীলতা আন্দোলিত হইতেছে।

সরোষ কণ্ঠে ডাকিলেন, "নলিন!"

কেহ উত্তর দিল না। বুঝিলেন অবাধ্য নলিন বন্দীশালা হইতে কোন ক্রমে পলায়ন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে রাগাইতে আসিয়াছে!

তখন অত্যন্ত কঠিনভাবে অধরের উপরে ওষ্ঠ চাপিয়া বিধবা প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন।

লতাকুঞ্জের নিকট পুনরায় ডাকিলেন—নলিন!

উত্তর পাইলেন না। শাখা তুলিয়া দেখিলেন, একটা অত্যন্ত মলিন শূকর প্রাণ ভয়ে ঘন পল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

যে লতাবিতান এই ইষ্টক প্রাচীরের মধ্যে বৃন্দাবিপিনের

সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ; যাহার বিকশিত কুসুমমঞ্জরীর সৌরভ গোপীবৃন্দের সুগন্ধি নিশ্বাস স্মরণ করাইয়া দেয় এবং কালিন্দী-তীরবর্ত্তী সুখবিহারের সৌন্দর্য্যস্বপ্ন জাগ্রত করিয়া তোলে—বিধবার সেই প্রাণাধিক যত্নের সুপবিত্র নন্দনভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল।

পূজারি ব্রাহ্মণ লাঠিহস্তে তাড়া করিয়া আসিল।

জয়কালী তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং দ্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অনতিকাল পরেই সুরাপানে উন্মত্ত ডোমের দল মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশুর জন্য চীৎকার করিতে লাগিল।

জয়কালী রুদ্ধদ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, যা বেটারা ফিরে যা! আমার মন্দির অপবিত্র করিস্‌নে!

ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরাণী যে তাঁহার রাধানাথ জীউর মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দিবেন ইহা তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্ব্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজনামধারী অতি ক্ষুদ্র দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

মহামায়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মহামায়া এবং রাজীবলোচন উভয়ে নদীর ধারে একটা ভাঙ্গা মন্দিরে সাক্ষাৎ করিল।

মহামায়া কোন কথা না বলিয়া তাহার স্বাভাবিক গম্ভীর দৃষ্টি ঈষৎ ভর্ৎসনার ভাবে রাজীবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তাহার মর্ম্ম এই, তুমি কি সাহসে আজ অসময়ে আমাকে এখানে আহ্বান করিয়া আনিয়াছ? আমি এ পর্য্যন্ত তোমার সকল কথা শুনিয়া আসিতেছি বলিয়াই তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা বাড়িয়া উঠিয়াছে?

রাজীব একে মহামায়াকে বরাবর ঈষৎ ভয় করিয়া চলে তাহাতে এই দৃষ্টিপাতে তাহাকে ভারি বিচলিত করিয়া দিল—দুটা কথা গুছাইয়া বলিবে মনে করিয়াছিল, সে আশায় তৎক্ষণাৎ জলাঞ্জলি দিতে হইল। অথচ অবিলম্বে এই মিলনের একটা কোন কিছু কারণ না দেখাইলেও চলে না, তাই দ্রুত বলিয়া ফেলিল—"আমি প্রস্তাব করিতেছি, এখান হইতে পালাইয়া গিয়া আমরা দুজনে বিবাহ করি।"—রাজীবের যে কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য ছিল সে কথাটা ঠিক বলা হইল বটে, কিন্তু যে ভূমিকাটি মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল তাহার

কিছুই হইল না। কথাটা নিতান্ত নীরস নিরলঙ্কার, এমন কি, অদ্ভুত শুনিতে হইল। নিজে বলিয়া নিজে থতমত খাইয়া গেল—আরও দুটো পাঁচটা কথা জুড়িয়া ওটাকে যে বেশ একটু নরম করিয়া আনিবে তাহার সামর্থ্য রহিল না। ভাঙ্গা মন্দিরে নদীর ধারে এই মধ্যাহ্নকালে মহামায়াকে ডাকিয়া আনিয়া নির্ব্বোধ লোকটা শুদ্ধ কেবল বলিল, চল আমরা বিবাহ করিগে!

মহামায়া কুলীনের ঘরের কুমারী। বয়স চব্বিশ বৎসর। যেমন পরিপূর্ণ বয়স, তেমনি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য। যেন শরৎ-কালের রৌদ্রের মত কাঁচা সোনার প্রতিমা—সেই রৌদ্রের মতই দীপ্ত এবং নীরব এবং তাহার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক।

তাহার বাপ নাই; বড় ভাই আছেন—তাঁহার নাম ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়। ভাইবোন প্রায় এক প্রকৃতির লোক—মুখে কথাটি নাই কিন্তু এমনি একটা তেজ আছে যে, দিবা দ্বিপ্রহরের মত নিঃশব্দে দহন করে। লোকে ভবানী-চরণকে অকারণে ভয় করিত।

রাজীব লোকটা বিদেশী। এখানকার রেশমের কুঠির বড় সাহেব তাহাকে নিজের সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। রাজীবের বাপ এই সাহেবের কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে সাহেব তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্রের ভরণপোষণের ভার নিজে লইয়া তাহাকে বাল্যাবস্থায় এই বামনহাটীর কুঠিতে লইয়া

আসেন। আমি যে প্রাচীনকালের কথা বলিতেছি তখনকার সাহেবদের মধ্যে এরূপ সহৃদয়তা প্রায় দেখা যাইত। বালকের সঙ্গে কেবল তাহার স্নেহশীলা পিসি ছিলেন। ইঁহারা ভবানীচরণের প্রতিবেশীরূপে বাস করিতেন। মহামায়া রাজীবের বাল্যসঙ্গিনী ছিল এবং রাজীবের পিসির সহিত মহামায়ার সুদৃঢ় স্নেহবন্ধন ছিল।

রাজীবের বয়স ক্রমে ক্রমে ষোল, সতের, আঠারো, এমন কি, ঊনিশ হইয়া উঠিল, তথাপি পিসির বিস্তর অনুরোধ-সত্ত্বেও সে বিবাহ করিতে চায় না। সাহেব বাঙ্গালীর ছেলের এরূপ অসামান্য সুবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ভারি খুসি হইলেন; মনে করিলেন, ছেলেটি তাঁহাকেই আপনার জীবনের আদর্শ-স্থল করিয়াছে। সাহেব অবিবাহিত ছিলেন। ইতিমধ্যে পিসিরও মৃত্যু হইল।

এদিকে সাধ্যাতীত ব্যয় ব্যতীত মহামায়ার জন্যও অনুরূপ কুলসম্পন্ন পাত্র জোটে না। তাহারও কুমারী-বয়স ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য, যে, পরিণয়বন্ধন যে দেবতার কার্য্য তিনি যদিও এই নরনারীযুগলের প্রতি এ যাবৎ বিশেষ অমনোযোগ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু প্রণয়-বন্ধনের ভার যাঁহার প্রতি তিনি এতদিন সময় নষ্ট করেন নাই। বৃদ্ধ প্রজাপতি যখন ঢুলিতেছিলেন, যুবক কন্দর্প তখন সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় ছিলেন।

ভগবান কন্দর্পের প্রভাব ভিন্ন লোকের উপর ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। রাজীব তাঁহার প্ররোচনায় দুটো চারটে মনের কথা বলিবার অবসর খুঁজিয়া বেড়ায়, মহামায়া তাহাকে সে অবসর দেয় না—তাহার নিস্তব্ধ গম্ভীর দৃষ্টি রাজীবের ব্যাকুল হৃদয়ে একটা ভীতির সঞ্চার করিয়া দেয়।

আজ শতবার মাথার দিব্য দিয়া রাজীব মহামায়াকে এই ভাঙ্গা মন্দিরে আনিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে। তাই মনে করিয়াছিল, যত কিছু বলিবার আছে আজ সব বলিয়া লইবে, তাহার পরে, হয়, আমরণ সুখ, নয়, আজীবন মৃত্যু। জীবনের এমন একটা সঙ্কটের দিনে রাজীব কেবল কহিল—"চল, তবে বিবাহ করা যাউক্!" এবং তার পরে বিস্মৃত-পাঠ ছাত্রের মত থতমত খাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

রাজীব যে এরূপ প্রস্তাব করিবে মহামায়া যেন আশা করে নাই। অনেকক্ষণ তাই নীরব হইয়া রহিল।

মধ্যাহ্নকালের অনেকগুলি অনির্দ্দিষ্ট করুণধ্বনি আছে, সেইগুলি এই নিস্তব্ধতায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বাতাসে মন্দিরের অর্দ্ধসংলগ্ন ভাঙ্গা কপাট এক একবার অত্যন্ত মৃদু-মন্দ আর্ত্তস্বর সহকারে ধীরে ধীরে খুলিতে এবং বন্ধ হইতে লাগিল; মন্দিরের গবাক্ষে বসিয়া পায়রা বকম্-বকম্ করিয়া ডাকে, বাহিরে শিমুলগাছের শাখায় বসিয়া কাঠঠোক্‌রা এক-ঘেয়ে ঠক্‌ঠক্ শব্দ করে, শুষ্ক পত্ররাশির মধ্য দিয়া গিরগিটি সর্‌সর্ শব্দে ছুটিয়া যায়, হঠাৎ একটা উষ্ণবাতাস মাঠের দিক

হইতে আসিয়া সমস্ত গাছের পাতার মধ্যে ঝর্ঝর্ করিয়া উঠে, এবং হঠাৎ নদীর জল জাগিয়া উঠিয়া ভাঙ্গা ঘাটের সোপানের উপর ছলাৎছলাৎ করিয়া আঘাত করিতে থাকে। এইসমস্ত আকস্মিক অলস শব্দের মধ্যে বহুদূর তরুতল হইতে একটি রাখালের বাঁশিতে মেঠো সুর বাজিতেছে। রাজীব মহামায়ার মুখের দিকে চাহিতে সাহসী না হইয়া মন্দিরের ভিত্তির উপর ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া একপ্রকার শ্রান্ত স্বপ্নাবিষ্টের মত নদীর দিকে চাহিয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া রাজীব আর একবার ভিক্ষুকভাবে মহামায়ার মুখের দিকে চাহিল। মহামায়া মাথা নাড়িয়া কহিল—"না, সে হইতে পারে না।"

মহামায়ার মাথা যেমনি নড়িল, রাজীবের আশাও অমনি ভূমিসাৎ হইয়া গেল। কারণ, রাজীব সম্পূর্ণ জানিত মহামায়ার মাথা মহামায়ার নিজের নিয়মানুসারেই নড়ে, আর কাহারও সাধ্য নাই তাহাকে আপন মতে বিচলিত করে। প্রবল কুলাভিমান মহামায়ার বংশে কতকাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে—সে কি কথনো রাজীবের মত বংশজ ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতে পারে! ভালবাসা এক এবং বিবাহ করা আর। যাহা হউক্, মহামায়া বুঝিতে পারিল তাহার নিজের বিবেচনাহীন ব্যবহারেই রাজীবের এতদূর স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে; তৎক্ষণাৎ সে মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

রাজীব অবস্থা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি কহিল—"আমি কালই এদেশ হইতে চলিয়া যাইতেছি।"

মহামায়া প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, ভাবটা দেখাইবে—সে খবরে আমার কি আবশ্যক! কিন্তু পারিল না। পা তুলিতে গিয়া পা উঠিল না—শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল "কেন?"

রাজীব কহিল, আমার সাহেব এখান হইতে সোনাপুরের কুঠিতে বদ্‌লি হইতেছেন, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন।

মহামায়া আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ভাবিয়া দেখিল দুই জনের জীবনের গতি দুই দিকে—একটা মানুষকে চিরদিন নজরবন্দী করিয়া রাখা যায় না। তাই চাপা ঠোঁট ঈষৎ খুলিয়া কহিল—"আচ্ছা!" সেটা কতকটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের মত শুনাইল।

কেবল এই কথাটুকু বলিয়া মহামায়া পুনশ্চ গমনোদ্যত হইতেছে—এমন্ সময় রাজীব চমকিয়া উঠিয়া কহিল—"চাটুযো মহাশয়!"

মহামায়া দেখিল, ভবানীচরণ মন্দিরের অভিমুখে আসিতেছে, বুঝিল তাহাদের সন্ধান পাইয়াছে। রাজীব মহামায়ার বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া মন্দিরের ভগ্নভিত্তি দিয়া লাফাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিল। মহামায়া সবলে তাহার হাত ধরিয়া আটক করিয়া রাখিল। ভবানীচরণ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন—কেবল একবার নীরবে নিস্তব্ধভাবে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

মহামায়া রাজীবের দিকে চাহিয়া অবিচলিত ভাবে কহিল, "রাজীব, তোমার ঘরেই আমি যাইব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিও।"

ভবানীচরণ নিঃশব্দে মন্দির হইতে বাহির হইলেন, মহামায়াও নিঃশব্দে তাঁহার অনুগমন করিল—আর রাজীব হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—যেন তাহার ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই রাত্রেই ভবানীচরণ একখানা লাল চেলি আনিয়া মহামায়াকে বলিলেন—এইটে পরিয়া আইস।

মহামায়া পরিয়া আসিল। তাহার পর বলিলেন, "আমার সঙ্গে চল।"

ভবানীচরণের আদেশ, এমন কি, সঙ্কেতও কেহ কখন অমান্য করে নাই। মহামায়াও না।

সেই রাত্রে উভয়ে নদীতীরে শ্মশান অভিমুখে চলিলেন। শ্মশান বাড়ি হইতে অধিক দূর নহে। সেখানে গঙ্গাযাত্রীর ঘরে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিল। তাহারই শয্যাপার্শ্বে উভয়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরের এক কোণে পুরোহিত ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিল, ভবানীচরণ তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন। সে অবিলম্বে শুভানুষ্ঠানের আয়োজন

করিয়া লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল; মহামায়া বুঝিল এই মুমূর্ষুর সহিত তাহার বিবাহ। সে আপত্তির লেশমাত্র প্রকাশ করিল না। দুইটি অদূরবর্ত্তী চিতার আলোকে অন্ধকারপ্রায় গৃহে মৃত্যুযন্ত্রণার আর্ত্তধ্বনির সহিত অস্পষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ মিশ্রিত করিয়া মহামায়ার বিবাহ হইয়া গেল।

যে দিন বিবাহ তাহার পরদিনই মহামায়া বিধবা হইল। এই দুর্ঘটনায় বিধবা অতিমাত্র শোক অনুভব করিল না— এবং রাজীবও মহামায়ার অকস্মাৎ বিবাহসংবাদে যেরূপ বজ্রাহত হইয়াছিল, বৈধব্যসংবাদে সেরূপ হইল না। এমন কি, কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু সে ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। দ্বিতীয় আর একটা বজ্রাঘাতে রাজীবকে একেবারে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। সে সংবাদ পাইল, শ্মশানে আজ ভারি ধুম। মহামায়া সহমৃতা হইতেছে।

প্রথমেই সে ভাবিল, সাহেবকে সংবাদ দিয়া তাঁহার সাহায্যে এই নিদারুণ ব্যাপার বলপূর্ব্বক রহিত করিবে। তাহার পরে মনে পড়িল, সাহেব আজই বদ্‌লি হইয়া সোনাপুরে রওনা হইয়াছে—রাজীবকেও সঙ্গে লইতে চাহিয়াছিল কিন্তু রাজীব একমাসের ছুটি লইয়া থাকিয়া গেছে।

মহামায়া তাহাকে বলিয়াছে "তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিও।" সে কথা সে কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে পারে না। আপাততঃ একমাসের ছুটি লইয়াছে, আবশ্যক হইলে দুই মাস, ক্রমে তিন মাস এবং অবশেষে সাহেবের কর্ম্ম ছাড়িয়া

দিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইবে, তবু চিরজীবন অপেক্ষা করিতে ছাড়িবে না।

রাজীব যখন পাগলের মত ছুটিয়া হয় আত্মহত্যা, নয় একটা কিছু করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সন্ধ্যা-কালে মুষলধারায় বৃষ্টির সহিত একটা প্রলয়-ঝড় উপস্থিত হইল। এম্‌নি ঝড় যে, রাজীবের মনে হইল বাড়ি মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। যখন দেখিল, বাহ্যপ্রকৃতিতেও তাহার অন্তরের অনুরূপ একটা মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে যেন কতকটা শান্ত হইল। তাহার মনে হইল, সমস্ত প্রকৃতি তাহার হইয়া একটা কোনরূপ প্রতিবিধান করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সে নিজে যতটা শক্তিপ্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিত মাত্র কিন্তু পারিত না, প্রকৃতি আকাশপাতাল জুড়িয়া ততটা শক্তিপ্রয়োগ করিয়া কাজ করিতেছে।

এমন সময়ে বাহির হইতে সবলে কে দ্বার ঠেলিল। রাজীব তাড়াতাড়ি খুলিয়া দিল। ঘরের মধ্যে আর্দ্রবস্ত্রে একটি স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল, তাহার মাথায় সমস্ত মুখ ঢাকিয়া ঘোম্‌টা। রাজীব তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল, সে মহামায়া।

উচ্ছ্বসিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"মহামায়া, তুমি চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়াছ?"

মহামায়া কহিল "হাঁ! আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তোমার ঘরে আসিব। সেই অঙ্গীকার পালন

করিতে আসিয়াছি। কিন্তু রাজীব, আমি ঠিক সে আমি নাই, আমার সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কেবল আমি মনে মনে সেই মহামায়া আছি। এখনো বল, এখনো আমার চিতায় ফিরিয়া যাইতে পারিব। আর যদি প্রতিজ্ঞা কর কখনো আমার ঘোমটা খুলিবে না, আমার মুখ দেখিবে না—তবে আমি তোমার ঘরে থাকিতে পারি।”

মৃত্যুর হাত হইতে ফিরিয়া পাওয়াই যথেষ্ট, তখন আর সমস্তই তুচ্ছজ্ঞান হয়। রাজীব তাড়াতাড়ি কহিল “তুমি যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া থাকিও—আমাকে ছাড়িয়া গেলে আর আমি বাঁচিব না।”

মহামায়া কহিল “তবে এখনি চল—তোমার সাহেব যেখানে বদ্‌লি হইয়াছে সেইখানে যাই।”

ঘরে যাহা কিছু ছিল সমস্ত ফেলিয়া রাজীব মহামায়াকে লইয়া সেই ঝড়ের মধ্যে বাহির হইল। এম্‌নি ঝড় যে দাঁড়ান কঠিন—ঝড়ের বেগে কঙ্কর উড়িয়া আসিয়া ছিটাগুলির মত গায়ে বিঁধিতে লাগিল। মাথার উপরে গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িবার ভয়ে পথ ছাড়িয়া উভয়ে খোলা মাঠ দিয়া চলিতে লাগিল। বায়ুর বেগ পশ্চাৎ হইতে আঘাত করিল। যেন ঝড়ে লোকালয় হইতে দুইটা মানুষকে ছিন্ন করিয়া প্রলয়ের দিকে উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গল্পটা পাঠকেরা নিতান্ত অমূলক অথবা অলৌকিক মনে করিবেন না। যখন সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন এমন ঘটনা কদাচিৎ মাঝে মাঝে ঘটিতে শুনা গিয়াছে।

মহামায়ার হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে চিতায় সমর্পণ করিয়া যথাসময়ে অগ্নিপ্রয়োগ করা হইয়াছিল। অগ্নিও ধূধূ করিয়া ধরিয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে প্রচণ্ড ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। যাহারা দাহ করিতে আসিয়াছিল তাহারা তাড়াতাড়ি গঙ্গাযাত্রীর ঘরে আশ্রয় লইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। বৃষ্টিতে চিতানল নিবিতে বিলম্ব হইল না। ইতিমধ্যে মহামায়ার হাতের বন্ধন ভস্ম হইয়া তাহার হাত দুটি মুক্ত হইয়াছে। অসহ্য দাহযন্ত্রণায় একটিমাত্র কথা না কহিয়া মহামায়া উঠিয়া বসিয়া পায়ের বন্ধন খুলিল। তাহার পর, স্থানে স্থানে দগ্ধ বস্ত্রখণ্ড গাত্রে জড়াইয়া উলঙ্গপ্রায় মহামায়া চিতা হইতে উঠিয়া প্রথমে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল। গৃহে কেহই ছিল না, সকলেই শ্মশানে। প্রদীপ জ্বালিয়া একখানি কাপড় পরিয়া মহামায়া একবার দর্পণে মুখ দেখিল। দর্পণ ভূমিতে আছাড়িয়া ফেলিয়া একবার কি ভাবিল। তাহার পর মুখের উপর দীর্ঘ ঘোম্‌টা টানিয়া অদূরবর্ত্তী রাজীবের বাড়ি গেল। তাহার পর কি ঘটিল পাঠকের অগোচর নাই।

মহামায়া এখন রাজীবের ঘরে, কিন্তু রাজীবের জীবনে

সুখ নাই। অধিক নহে, উভয়ের মধ্যে কেবল একখানি মাত্র ঘোম্‌টার ব্যবধান। কিন্তু সেই ঘোম্‌টাটুকু মৃত্যুর ন্যায় চিরস্থায়ী, অথচ মৃত্যুর অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক। কারণ, নৈরাশ্যে মৃত্যুর বিচ্ছেদ-বেদনাকে কালক্রমে অসাড় করিয়া ফেলে, কিন্তু এই ঘোম্‌টার বিচ্ছেদটুকুর মধ্যে একটি জীবন্ত আশা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে পীড়িত হইতেছে।

একে মহামায়ার চিরকালই একটা নিস্তব্ধ নীরব ভাব আছে, তাহাতে এই ঘোম্‌টার ভিতরকার নিস্তব্ধতা দ্বিগুণ দুঃসহ বোধ হয়। সে যেন একটা মৃত্যুর মধ্যে আবৃত হইয়া বাস করিতেছে। এই নিস্তব্ধ মৃত্যু রাজীবের জীবনকে আলিঙ্গন করিয়া প্রতিদিন যেন বিশীর্ণ করিতে লাগিল। রাজীব পূর্ব্বে যে মহামায়াকে জানিত তাহাকেও হারাইল এবং তাহার সেই আশৈশব সুন্দর স্মৃতিকে যে আপনার সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে, এই ঘোম্‌টাচ্ছন্ন মূর্ত্তি চিরদিন পার্শ্বে থাকিয়া নীরবে তাহাতেও বাধা দিতে লাগিল। রাজীব ভাবিত, মানুষে মানুষে স্বভাবতই যথেষ্ট ব্যবধান আছে—বিশেষতঃ মহামায়া পুরাণ-বর্ণিত কর্ণের মত সহজ কবচধারী—সে আপনার স্বভাবের চারিদিকে একটা আবরণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার পর মাঝে আবার যেন আর একবার জন্মগ্রহণ করিয়া আবার আরো একটা আবরণ লইয়া আসিয়াছে, অহরহ পার্শ্বে থাকিয়াও সে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, রাজীব যেন আর তাহার নাগাল পায় না—

কেবল একটা মায়াগণ্ডীর বাহিরে বসিয়া অতৃপ্ত তৃষিত হৃদয়ে এই সূক্ষ্ম অথচ অটল রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে—নক্ষত্র যেমন প্রতিরাত্রি নিদ্রাহীন নির্নিমেষ নতনেত্রে অন্ধকার নিশীথিনীকে ভেদ করিবার প্রয়াসে নিষ্ফলে নিশিযাপন করে।

এমনি করিয়া এই দুই সঙ্গীহীন একক প্রাণী কতকাল একত্র যাপন করিল।

একদিন বর্ষাকালে শুক্লপক্ষ দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল। নিস্পন্দ জ্যোৎস্না-রাত্রি সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে রাত্রে নিদ্রাত্যাগ করিয়া রাজীবও আপনার জানালায় বসিয়া ছিল। গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির শ্রান্তরব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। রাজীব দেখিতেছিল অন্ধকার তরুশ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মার্জ্জিত রূপার পাতের মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। মানুষ এ রকম সময় স্পষ্ট একটা কোন কথা ভাবে কি না বলা শক্ত। কেবল তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ একটা কোন দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে—বনের মত একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয়, রাত্রির মত একটা ঝিল্লিধ্বনি করে। রাজীব কি ভাবিল জানি না, কিন্তু তাহার মনে হইল আজ যেন সমস্ত পূর্ব্ব নিয়ম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে, এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মত নিস্তব্ধ

সুন্দর এবং সুগম্ভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহামায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল।

স্বপ্নচালিতের মত উঠিয়া রাজীব মহামায়ার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিল। মহামায়া তখন ঘুমাইতেছিল।

রাজীব কাছে গিয়া দাঁড়াইল—মুখ নত করিয়া দেখিল—মহামায়ার মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হায়, এ কি! সে চিরপরিচিত মুখ কোথায়! চিতানল-শিখা তাহার নিষ্ঠুর লেলিহান রসনায় মহামায়ার বামগণ্ড হইতে কিয়দংশ সৌন্দর্য্য একেবারে লেহন করিয়া লইয়া আপনার ক্ষুধার চিহ্ন রাখিয়া গেছে।

বোধ করি রাজীব চমকিয়া উঠিয়াছিল, বোধ করি একটা অব্যক্ত ধ্বনিও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকিবে। মহামায়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিল—দেখিল সম্মুখে রাজীব। তৎক্ষণাৎ ঘোম্‌টা টানিয়া শয্যা ছাড়িয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজীব বুঝিল এইবার বজ্র উদ্যত হইয়াছে। ভূমিতে পড়িল—পায়ে ধরিয়া কহিল, "আমাকে ক্ষমা কর।"

মহামায়া একটি উত্তরমাত্র না করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য পশ্চাতে না ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাজীবের ঘরে আর সে প্রবেশ করিল না। কোথাও তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের নীরব ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে একটি সুদীর্ঘ দগ্ধচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেল।

একটা আষাঢ়ে গল্প।

দূর সমুদ্রের মধ্যে একটা দ্বীপ। সেখানে কেবল তাসের সাহেব, তাসের বিবি, টেক্কা এবং গোলামের বাস। দুরি তিরি হইতে নহলা দহলা পর্য্যন্ত আরো অনেক ঘর গৃহস্থ আছে কিন্তু তাহারা উচ্চ জাতীয় নহে।

টেক্কা সাহেব গোলাম এই তিনটেই প্রধান বর্ণ, নহলা দহলারা অন্ত্যজ, তাহাদের সহিত এক পংক্তিতে বসিবার যোগ্য নহে।

কিন্তু চমৎকার শৃঙ্খলা। কাহার কত মূল্য এবং মর্য্যাদা তাহা বহুকাল হইতে স্থির হইয়া গেছে, তাহার রেখামাত্র ইতস্ততঃ হইবার যো নাই। সকলেই যথানির্দ্দিষ্টমতে আপন-আপন কাজ করিয়া যায়। বংশাবলিক্রমে কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী-দিগের উপর দাগ বুলাইয়া চলা।

সে যে কি কাজ তাহা বিদেশীর পক্ষে বোঝা শক্ত। হঠাৎ খেলা বলিয়া ভ্রম হয়। কেবল নিয়মে চলা ফেরা, নিয়মে যাওয়া-আসা, নিয়মে ওঠাপড়া। অদৃশ্য হস্তে তাহা-দিগকে চালনা করিতেছে এবং তাহারা চলিতেছে।

তাহাদের মুখে কোন ভাবের পরিবর্ত্তন নাই। চিরকাল একমাত্র ভাব ছাপ মারা রহিয়াছে। যেন ফ্যাল্ ফ্যাল্ ছবির মত। মান্ধাতার আমল হইতে মাথার টুপি অবধি পায়ের জুতা পর্য্যন্ত অবিকল সমভাবে রহিয়াছে।

কখনো কাহাকেও চিন্তা করিতে হয় না, বিবেচনা করিতে হয় না; সকলেই মৌন নির্জ্জীবভাবে নিঃশব্দে পদচারণা করিয়া বেড়ায়; পতনের সময় নিঃশব্দে পড়িয়া যায় এবং অবিচলিত মুখশ্রী লইয়া চিৎ হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে।

কাহারো কোন আশা নাই, অভিলাষ নাই, ভয় নাই, নূতন পথে চলিবার চেষ্টা নাই, হাসি নাই, কান্না নাই, সন্দেহ নাই, দ্বিধা নাই। খাঁচার মধ্যে যেমন পাখী ঝট্‌পট্‌ করে, এই চিত্রিতবৎ মূর্ত্তিগুলির অন্তরে সেরূপ কোন একটা জীবন্ত প্রাণীর অশান্ত আক্ষেপের লক্ষণ দেখা যায় না।

অথচ এককালে এই খাঁচাগুলির মধ্যে জীবের বসতি ছিল—তখন খাঁচা দুলিত, এবং ভিতর হইতে পাখার শব্দ এবং গান শুনা যাইত। গভীর অরণ্য এবং বিস্তৃত আকাশের কথা মনে পড়িত।—এখন কেবল পিঞ্জরের সঙ্কীর্ণতা এবং সুশৃঙ্খল-শ্রেণী-বিন্যস্ত লৌহ শলাকাগুলাই অনুভব করা যায়—পাখী উড়িয়াছে, কি মরিয়াছে, কি জীবন্মৃত হইয়া আছে তাহা কে বলিতে পারে!

আশ্চর্য্য স্তব্ধতা এবং শান্তি! পরিপূর্ণ স্বস্তি এবং সন্তোষ। পথে ঘাটে গৃহে সকলি সুসংযত, সুবিহিত,—শব্দ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, উৎসাহ নাই, আগ্রহ নাই—কেবল নিত্য-নৈমিত্তিক ক্ষুদ্র কাজ এবং ক্ষুদ্র বিশ্রাম।

সমুদ্র অবিশ্রাম একতান শব্দপূর্ব্বক তটের উপর সহস্র

ফেনশুভ্র কোমল করতলের আঘাত করিয়া সমস্ত দ্বীপকে নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—পক্ষীমাতার দুই প্রসারিত নীলপক্ষের মত আকাশ দিক্‌দিগন্তের শান্তিরক্ষা করিতেছে। অতিদূর পরপারে গাঢ় নীল রেখার মত বিদেশের আভাস দেখা যায়—সেখান হইতে রাগদ্বেষের দ্বন্দ্বকোলাহল সমুদ্র পার হইয়া আসিতে পারে না।

২

সেই পরপারে সেই বিদেশে এক দুয়ারাণীর ছেলে এক রাজপুত্র বাস করে। সে তাহার নির্ব্বাসিত মাতার সহিত সমুদ্রতীরে আপন মনে বাল্যকাল যাপন করিতে থাকে।

সে একা বসিয়া বসিয়া মনে মনে এক অত্যন্ত বৃহৎ অভিলাষের জাল বুনিতেছে। সেই জাল দিগ্‌দিগন্তরে নিক্ষেপ করিয়া কল্পনায় বিশ্বজগতের নব নব রহস্যরাশি সংগ্রহ করিয়া আপনার দ্বারের কাছে টানিয়া তুলিতেছে। তাহার অশান্ত চিত্ত সমুদ্রের তীরে, আকাশের সীমায় ঐ দিগন্তরোধী নীল গিরিমালার পরপারে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে—খুঁজিতে চায় কোথায় পক্ষীরাজ ঘোড়া, সাপের মাথার মাণিক, পারিজাত পুষ্প, সোনার কাঠি রূপার কাঠি পাওয়া যায়, কোথায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে দুর্গম দৈত্যভবনে স্বপ্নসম্ভবা অলোকসুন্দরী রাজকুমারী ঘুমাইয়া রহিয়াছেন।

রাজপুত্র পাঠশালে পড়িতে যায়, সেখানে পাঠান্তে সদা-

গরের পুত্রের কাছে দেশবিদেশের কথা এবং কোটালের পুত্রের কাছে তাল বেতালের কাহিনী শোনে।

ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়ে, মেঘে অন্ধকার হইয়া থাকে,—গৃহদ্বারে মায়ের কাছে বসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রাজপুত্র বলে, মা, একটা খুব দূর দেশের গল্প বল। মা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার বাল্যশ্রুত এক অপূর্ব্ব দেশের অপূর্ব্ব গল্প বলিতেন—বৃষ্টির ঝর্ ঝর্ শব্দের মধ্যে সেই গল্প শুনিয়া রাজপুত্রের হৃদয় উদাস হইয়া যাইত।

একদিন সদাগরের পুত্র আসিয়া রাজপুত্রকে কহিল—"সাঙ্গাৎ, পড়াশুনা ত সাঙ্গ করিয়াছি, এখন একবার দেশভ্রমণে বাহির হইব, তাই বিদায় লইতে আসিলাম।"

রাজার পুত্র কহিল আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। কোটালের পুত্র কহিল আমাকে কি একা ফেলিয়া যাইবে? আমিও তোমাদের সঙ্গী।

রাজপুত্র দুঃখিনী মাকে গিয়া বলিল, মা, আমি ভ্রমণে বাহির হইতেছি—এবার তোমার দুঃখমোচনের উপায় করিয়া আসিব।

তিন বন্ধুতে বাহির হইয়া পড়িল।

৩

সমুদ্রে সদাগরের দ্বাদশতরী প্রস্তুত ছিল—তিন বন্ধু চড়িয়া বসিল। দক্ষিণের বাতাসে পাল ভরিয়া উঠিল—নৌকাগুলো রাজপুত্রের হৃদয়বাসনার মত ছুটিয়া চলিল।

শঙ্খদ্বীপে গিয়া এক নৌকা শঙ্খ, চন্দন দ্বীপে গিয়া এক নৌকা চন্দন, প্রবাল দ্বীপে গিয়া এক নৌকা প্রবাল বোঝাই হইল।

তাহার পর আর চারি বৎসরে গজদন্ত মৃগনাভি লবঙ্গ জায়ফলে যখন আর চারিটি নৌকা পূর্ণ হইল, তখন সহসা একটা বিপর্য্যয় ঝড় আসিল।

সব ক'টা নৌকা ডুবিল, কেবল একটি নৌকা তিন বন্ধুকে একটা দ্বীপে আছাড়িয়া ফেলিয়া খান্ খান্ হইয়া গেল।

এই দ্বীপে তাসের টেক্কা, তাসের সাহেব, তাসের বিবি, তাসের গোলাম যথানিয়মে বাস করে এবং দহলা নহলা-গুলোও তাহাদের পদানুবর্ত্তী হইয়া যথানিয়মে কাল কাটায়।

৪

তাসের রাজ্যে এতদিন কোন উপদ্রব ছিল না এই প্রথম গোলযোগের সূত্রপাত হইল।

এতদিন পরে এই একটা প্রথম তর্ক উঠিল—এই যে তিনটে লোক হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিল ইহাদিগকে কোন শ্রেণীতে ফেলা যাইবে?

প্রথমতঃ ইহারা কোন্ জাতি—টেক্কা, সাহেব, গোলাম, না দহলা নহলা?

দ্বিতীয়তঃ, ইহারা কোন্ গোত্র, ইস্কাবন্, চিঁড়েতন, হর্‌তন অথবা রুহিতন?

এ সমস্ত স্থির না হইলে ইহাদের সহিত কোনরূপ ব্যব-

হার করাই কঠিন। ইহারা কাহার অন্ন খাইবে, কাহার সহিত বাস করিবে, ইহাদের মধ্যে অধিকারভেদে কেই বা বায়ু কোণে, কেই বা নৈঋত কোণে, কেই বা ঈশান কোণে মাথা রাখিয়া এবং কেই বা দণ্ডায়মান হইয়া নিদ্রা দিবে তাহার কিছুই স্থির হয় না।

এ রাজ্যে এতবড় বিষম দুশ্চিন্তার কারণ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ঘটে নাই।

কিন্তু ক্ষুধাকাতর বিদেশী বন্ধু তিনটির এ সকল গুরুতর বিষয়ে তিলমাত্র চিন্তা নাই। তাহারা কোন গতিকে আহার পাইলে বাঁচে। যখন দেখিল তাহাদের আহারাদি দিতে সকলে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, এবং বিধান খুঁজিবার জন্য টেক্কারা বিরাট সভা আহ্বান করিল, তখন তাহারা যে যেখানে যে খাদ্য পাইল খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

এই ব্যবহারে দুরি তিরি পর্য্যন্ত অবাক্। তিরি কহিল ভাই দুরি, ইহাদের বাচবিচার কিছুই নাই। দুরি কহিল, ভাই তিরি, বেশ দেখিতেছি ইহারা আমাদের অপেক্ষাও নীচজাতীয়।

আহারাদি করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া তিন বন্ধু দেখিল, এখানকার মানুষগুলা কিছু নূতন রকমের। যেন জগতে ইহাদের কোথাও মূল নাই। যেন ইহাদের টিকি ধরিয়া কে উৎপাটন করিয়া লইয়াছে, ইহারা একপ্রকার হতবুদ্ধিভাবে সংসারের স্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া দুলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছে। যাহা কিছু করিতেছে তাহা যেন আর একজন কে করাইতেছে।

ঠিক যেন পুঁৎলা বাজির দোদুল্যমান পুঁতুলগুলির মত। তাই কাহারো মুখে ভাব নাই, ভাবনা নাই, সকলেই নিরতিশয় গম্ভীর চালে যথানিয়মে চলাফেরা করিতেছে। অথচ সবসুদ্ধ ভারি অদ্ভুত দেখাইতেছে।

চারিদিকে এই জীবন্ত নির্জ্জীবতার পরম গম্ভীর রকম সকম দেখিয়া রাজপুত্র আকাশে মুখ তুলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

এই আন্তরিক কৌতুকের উচ্চ হাস্যধ্বনি তাসরাজ্যের কলরবহীন রাজপথে ভারি বিচিত্র শুনাইল। এখানে সকলই এম্‌নি একান্ত যথাযথ, এম্‌নি পরিপাটি, এম্‌নি প্রাচীন, এম্‌নি সুগম্ভীর যে, কৌতুক আপনার অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত উচ্ছৃঙ্খল শব্দে আপনি চকিত হইয়া ম্লান হইয়া নির্ব্বাপিত হইয়া গেল—চারিদিকের লোকপ্রবাহ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ স্তব্ধ গম্ভীর অনুভূত হইল।

কোটালের পুত্র এবং সদাগরের পুত্র ব্যাকুল হইয়া রাজপুত্রকে কহিল "ভাই সাঙ্গাৎ, এই নিরানন্দ ভূমিতে আর একদণ্ড নয়! এখানে আর দুই দিন থাকিলে মাঝে মাঝে আপনাকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে হইবে জীবিত আছি কি না।"

রাজপুত্র কহিল, "না ভাই, আমার কৌতূহল হইতেছে। ইহারা মানুষের মত দেখিতে—ইহাদের মধ্যে এক ফোঁটা জীবন্ত পদার্থ আছে কি না একবার নাড়া দিয়া দেখিতে হইবে।"

৫

এম্‌নি ত কিছু কাল যায়। কিন্তু এই তিনটে বিদেশী যুবক কোন নিয়মের মধ্যেই ধরা দেয় না। যেখানে যখন ওঠা, বসা, মুখ ফেরানো, উপুড় হওয়া, চিৎ হওয়া, মাথা নাড়া, ডিগ্‌বাজি খাওয়া উচিত ইহারা তাহার কিছুই করে না, বরং সকৌতুকে নিরীক্ষণ করে এবং হাসে। এই সমস্ত যথাবিহিত অশেষ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে একটি দিগ্‌গজ গাম্ভীর্য্য আছে ইহারা তদ্দ্বারা অভিভূত হয় না।

একদিন টেক্কা সাহেব গোলাম আসিয়া রাজপুত্র, কোটালের পুত্র এবং সদাগরের পুত্রকে হাঁড়ির মত গলা করিয়া অবিচলিত গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা বিধানমতে চলিতেছ না কেন?"

তিন বন্ধু উত্তর করিলেন, "আমাদের ইচ্ছা।"

হাঁড়ির মত গলা করিয়া তাসরাজ্যের তিন অধিনায়ক স্বপ্নাভিভূতের মত বলিল "ইচ্ছা! সে বেটা কে?"

ইচ্ছা কি, সে দিন বুঝিল না কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝিল। প্রতিদিন দেখিতে লাগিল, এমন করিয়া না চলিয়া অমন করিয়া চলাও সম্ভব, যেমন এদিক আছে তেমনি ওদিকও আছে, বিদেশ হইতে তিনটে জীবন্ত দৃষ্টান্ত আসিয়া জানাইয়া দিল বিধানের মধ্যেই মানবের সমস্ত স্বাধীনতার সীমা নহে। এম্‌নি করিয়া তাহারা ইচ্ছা নামক একটা রাজশক্তির প্রভাব অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিতে লাগিল।

ঐ সেটি যেমনি অনুভব করা অমনি তাসরাজ্যের আগাগোড়া অল্প অল্প করিয়া আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হইল—গতনিদ্র প্রকাণ্ড অজগর সর্পের অনেকগুলা কুণ্ডলীর মধ্যে জাগরণ যেমন অত্যন্ত মন্দগতিতে সঞ্চলন করিতে থাকে সেইরূপ।

৬

নির্ব্বিকারমূর্ত্তি বিবি এতদিন কাহারো দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই—নির্ব্বাক্ নিরুদ্বিগ্নভাবে আপনার কাজ করিয়া গেছে। এখন একদিন বসন্তের অপরাহ্নে ইহাদের মধ্যে একজন চকিতের মধ্যে ঘনকৃষ্ণপক্ষ্ম ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া রাজপুত্রের দিকে মুগ্ধনেত্রের কটাক্ষপাত করিল। রাজপুত্র চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "এ কি সর্ব্বনাশ! আমি জানিতাম ইহারা এক একটা মূর্ত্তিবৎ তাহাত নহে, দেখিতেছি এ যে নারী!"

কোটালের পুত্র ও সদাগরের পুত্রকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া রাজকুমার কহিল—"ভাই, ইহার মধ্যে বড় মাধুর্য্য আছে। তাহার সেই নবভাবোদ্দীপ্ত কৃষ্ণনেত্রের প্রথম কটাক্ষপাতে আমার মনে হইল যেন আমি এক নূতনসৃষ্ট জগতের প্রথম ঊষার প্রথম উদয় দেখিতে পাইলাম! এতদিন যে ধৈর্য্য ধরিয়া অবস্থান করিতেছি আজ তাহা সার্থক হইল।"

দুই বন্ধু পরম কৌতূহলের সহিত সহাস্যে কহিল, "সত্য না কি সাঙ্গাৎ!"

সেই হতভাগিনী হরতনের বিবিটি আজ হইতে প্রতিদিন

নিয়ম ভুলিতে লাগিল। তাহার যখন যেখানে হাজির হওয়া বিধান, মুহুর্মুহু তাহার ব্যতিক্রম হইতে আরম্ভ হইল। মনে কর, যখন তাহাকে গোলামের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে—তখন সে হঠাৎ রাজপুত্রের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়। গোলাম অবিচলিতভাবে সুগম্ভীর কণ্ঠে বলে, বিবি তোমার ভুল হইল। শুনিয়া হরতনের বিবির স্বভাবতঃ রক্তকপোল অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, তাহার নির্নিমেষ প্রশান্ত দৃষ্টি নত হইয়া যায়। রাজপুত্র উত্তর দেয়—কিছু ভুল হয় নাই; আজ হইতে আমিই গোলাম।

নবপ্রস্ফুটিত রমণীহৃদয় হইতে এ কি অভূতপূর্ব্ব শোভা, এ কি অভাবনীয় লাবণ্য বিস্ফুরিত হইতে লাগিল! তাহার গতিতে এ কি সুমধুর চাঞ্চল্য, তাহার দৃষ্টিপাতে এ কি হৃদয়ের হিল্লোল, তাহার সমস্ত অস্তিত্ব হইতে এ কি একটি সুগন্ধি আরতি উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে!

এই নব অপরাধিনীর ভ্রম সংশোধনে সাতিশয় মনোযোগ করিতে গিয়া আজকাল সকলেরই ভ্রম হইতে লাগিল। টেক্কা আপনার চিরন্তন মর্য্যাদা রক্ষার কথা বিস্মৃত হইল, সাহেবে গোলামে আর প্রভেদ থাকে না, দহলা নহলাগুলারা পর্য্যন্ত কেমন হইয়া গেল!

এই পুরাতন দ্বীপে বসন্তের কোকিল অনেকবার ডাকিয়াছে কিন্তু সেইবার যেমন ডাকিল এমন আর কখনো ডাকে নাই। সমুদ্র চিরদিন একতান কলধ্বনিতে গান করিয়া আসি-

রাছে, কিন্তু এতদিন সে সনাতন বিধানের অলঙ্ঘ্য মহিমা একস্বরে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, আজ সহসা দক্ষিণবায়ু-চঞ্চল বিশ্বব্যাপী দুরন্ত যৌবনতরঙ্গরাশির মত আলোতে ছায়াতে ভঙ্গীতে ভাষাতে আপনার অগাধ আকুলতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

৭

এই কি সেই টেক্কা, সেই সাহেব, সেই গোলাম! কোথায় গেল সেই পরিতুষ্ট পরিপুষ্ট সুগোল মুখচ্ছবি! কেহ বা আকাশের দিকে চায়, কেহ বা সমুদ্রের ধারে বসিয়া থাকে, কাহারো বা রাত্রে নিদ্রা হয় না, কাহারো বা আহারে মন নাই।

মুখে কাহারো ঈর্ষ্যা, কাহারো অনুরাগ, কাহারো ব্যাকুলতা, কাহারো সংশয়। কোথাও হাসি, কোথাও রোদন, কোথাও সঙ্গীত। সকলেরই নিজের নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। সকলেই আপনার সহিত অন্যের তুলনা করিতেছে।

টেক্কা ভাবিতেছে, সাহেব ছোকরাটাকে দেখিতে নেহাৎ মন্দ না হৌক্ কিন্তু উহার শ্রী নাই—আমার চালচলনের মধ্যে এমন একটা মাহাত্ম্য আছে যে কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টি আমার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

সাহেব ভাবিতেছে—টেক্কা সর্ব্বদা ভারি টক্‌টক্ করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বেড়াইতেছে, মনে করিতেছে উহাকে দেখিয়া

বিবিগুলা বুক ফাটিয়া মারা গেল!—বলিয়া ঈষৎ বক্র হাসিয়া দর্পণে মুখ দেখিতেছে।

দেশে যতগুলি বিবি ছিলেন সকলেই প্রাণপণে সাজ-সজ্জা করেন আর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন "আ মরিয়া যাই! গর্ব্বিণীর এত সাজের ধুম কিসের জন্য গো বাপু! উহার রকমসকম দেখিয়া লজ্জা করে!" বলিয়া দ্বিগুণ প্রযত্নে হাবভাব বিস্তার করিতে থাকেন।

আবার কোথাও দুই সখায় কোথাও দুই সখীতে গলা ধরিয়া নিভৃতে বসিয়া গোপন কথাবার্ত্তা হইতে থাকে। কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন রাগ করে, কখন মান অভিমান চলে, কখন সাধাসাধি হয়।

যুবকগুলা পথের ধারে বনের ছায়ায় তরুমূলে পৃষ্ঠ রাখিয়া শুষ্কপত্ররাশির উপর পা ছড়াইয়া অলস ভাবে বসিয়া থাকে। বালা সুনীল্ বসন পরিয়া সেই ছায়াপথ দিয়া আপন মনে চলিতে চলিতে সেইখানে আসিয়া মুখ নত করিয়া চোখ ফিরাইয়া লয়, যেন কাহাকেও দেখিতে পায় নাই, যেন কাহা-কেও দেখা দিতে আসে নাই,—এমনি ভাব করিয়া চলিয়া যায়।

তাই দেখিয়া কোন কোন ক্ষেপা যুবক দুঃসাহসে ভর করিয়া তাড়াতাড়ি কাছে অগ্রসর হয়, কিন্তু মনের মত এক-টাও কথা যোগায় না, অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, অনু-কূল অবসর চলিয়া যায় এবং রমণীও অতীত মুহূর্ত্তের মত ক্রমে ক্রমে দূরে বিলীন হইয়া যায়।

মাথার উপরে পাখী ডাকিতে থাকে, বাতাস অঞ্চল ও অলক উড়াইয়া হু হু করিয়া বহিয়া যায়, তরুপল্লব ঝর্ ঝর্ মর্ মর্ করে, এবং সমুদ্রের অবিশ্রাম উচ্ছ্বসিত ধ্বনি হৃদয়ের অব্যক্ত বাসনাকে দ্বিগুণ দোহুল্যমান করিয়া তোলে।

একটা বসন্তে তিনটে বিদেশী যুবক আসিয়া মরা গাঙ্গে এমনি একটা ভরা তুফান তুলিয়া দিল।

৮

রাজপুত্র দেখিলেন জোয়ার ভাঁটার মাঝখানে সমস্ত দেশটা থম্ থম্ করিতেছে—কথা নাই কেবল মুখ চাওয়াচাওয়ি, কেবল এক পা এগোনো দুই পা পিছোনো, কেবল আপনার মনের বাসনা স্তূপাকার করিয়া বালির ঘর গড়া এবং বালির ঘর ভাঙ্গা। সকলেই যেন ঘরের কোণে বসিয়া আপনার অগ্নিতে আপনাকে আহুতি দিতেছে, এবং প্রতিদিন কৃশ ও বাক্যহীন হইয়া যাইতেছে। কেবল চোখ দুটা জ্বলিতেছে এবং অন্তর্নিহিত বাণীর আন্দোলনে ওষ্ঠাধর বায়ুকম্পিত পল্লবের মত স্পন্দিত হইতেছে।

রাজপুত্র সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—বাঁশি আন, তুরি ভেরি বাজাও, সকলে আনন্দধ্বনি কর, হরতনের বিবি স্বয়ম্বরা হইবেন।

তৎক্ষণাৎ দহলা নহলা বাঁশিতে ফুঁ দিতে লাগিল, দুরি তিরি তুরি-ভেরি লইয়া পড়িল। হঠাৎ এই তুমুল আনন্দ-তরঙ্গে সেই কানাকানি চাওয়াচাওয়ি ভাঙ্গিয়া গেল।

উৎসবে নরনারী একত্র মিলিত হইয়া কত কথা, কত হাসি, কত পরিহাস! কত রহস্যচ্ছলে মনের কথা বলা, কত ছল করিয়া অবিশ্বাস দেখানো, কত উচ্চ হাস্যে তুচ্ছ আলাপ। ঘন অরণ্যে বাতাস উঠিলে যেমন শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় লতায় বৃক্ষে নানা ভঙ্গিতে হেলাদোলা মেলামেলি হইতে থাকে ইহাদের মধ্যে তেম্‌নি হইতে লাগিল।

এম্‌নি কলরব আনন্দোৎসবের মধ্যে বাঁশিতে সকাল হইতে বড় মধুরস্বরে সাহানা বাজিতে লাগিল। আনন্দের মধ্যে গভীরতা, মিলনের মধ্যে ব্যাকুলতা, বিশ্বদৃশ্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য, এবং হৃদয়ে হৃদয়ে প্রীতির বেদনা সঞ্চার করিতে লাগিল। যাহারা ভাল করিয়া ভালবাসে নাই তাহারা ভালবাসিল, যাহারা ভালবাসিয়াছিল তাহারা আনন্দে উদাস হইয়া গেল।

হরতনের বিবি রাঙা বসন পরিয়া সমস্ত দিন একটা গোপন ছায়াকুঞ্জে বসিয়াছিল। তাহার কানেও দূর হইতে সাহানার তান প্রবেশ করিতেছিল এবং তাহার দুটি চক্ষু মুদিত হইয়া আসিয়াছিল—হঠাৎ এক সময়ে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, সম্মুখে রাজপুত্র বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে; সে অমনি কম্পিতদেহে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

রাজপুত্র সমস্ত দিন একাকী সমুদ্রতীরে পদচারণা করিতে করিতে সেই সন্ত্রস্ত নেত্রক্ষেপ এবং সলজ্জ লুণ্ঠন মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

৯

রাত্রে শত সহস্র দীপের আলোকে, মালার সুগন্ধে, বাঁশির সঙ্গীতে, অলঙ্কৃত সুসজ্জিত সহাস্য শ্রেণীবদ্ধ যুবকদের সভায় একটি বালিকা ধীরে ধীরে কম্পিতচরণে মালা হাতে করিয়া রাজপুত্রের সম্মুখে আসিয়া নতশিরে দাঁড়াইল। অভিলষিত কণ্ঠে মালাও উঠিল না, অভিলষিত মুখে চোখও তুলিতে পারিল না। রাজপুত্র তখন আপনি শির নত করিলেন এবং মাল্য স্খলিত হইয়া তাঁহার কণ্ঠে পড়িয়া গেল। চিত্রবৎ নিস্তব্ধ সভা সহসা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইয়া উঠিল।

সকলে বরকন্যাকে সমাদর করিয়া সিংহাসনে লইয়া বসাইল। রাজপুত্রকে সকলে মিলিয়া রাজ্যে অভিষেক করিল।

১০

সমুদ্রপারের দুঃখিনী দুয়ারাণী সোনার তরীতে চড়িয়া পুত্রের নবরাজ্যে আগমন করিলেন।

ছবির দল হঠাৎ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর পূর্ব্বের মত সেই অবিচ্ছিন্ন শান্তি এবং অপরিবর্ত্তনীয় গাম্ভীর্য্য নাই। সংসারপ্রবাহ আপনার সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ বিপদ সম্পদ লইয়া এই নবীন রাজার নব রাজ্যকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। এখন কেহ ভাল, কেহ মন্দ, কাহারো আনন্দ, কাহারো বিষাদ—এখন সকলে মানুষ। এখন সকলে অলংঘ্য বিধানমতে নিরীহ না হইয়া নিজের ইচ্ছামতে সাধু এবং অসাধু।

একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প।

গল্প বলিতে হইবে? কিন্তু আরত পারি না। এখন এই পরিশ্রান্ত অক্ষম ব্যক্তিটিকে ছুটি দিতে হইবে।

এ পদ আমাকে কে দিল বলা কঠিন। ক্রমে ক্রমে একে একে তোমরা পাঁচজন আসিয়া আমার চারিদিকে কখন্ জড় হইলে, এবং কেন যে তোমরা আমাকে এত অনুগ্রহ করিলে এবং আমার কাছে এত প্রত্যাশা করিলে, তাহা বলা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। অবশ্যই সে তোমাদের নিজগুণে; শুভাদৃষ্টক্রমে আমার প্রতি সহসা তোমাদের অনুগ্রহ উদয় হইয়াছিল। এবং যাহাতে সে অনুগ্রহ রক্ষা হয় সাধ্যমত আমার সে চেষ্টার ত্রুটি নাই।

কিন্তু পাঁচজনের অব্যক্ত অনির্দ্দিষ্ট সম্মতিক্রমে যে কার্য্য-ভার আমার প্রতি অর্পিত হইয়া পড়িয়াছে আমি তাহার যোগ্য নহি। ক্ষমতা আছে কি না আছে তাহা লইয়া বিনয় বা অহঙ্কার করিতে চাহি না; কিন্তু প্রধান কারণ এই যে, বিধাতা আমাকে নির্জ্জনচর জীবরূপেই গঠিত করিয়াছিলেন, খ্যাতি যশ জনতার উপযোগী করিয়া আমার গাত্রে কঠিন চর্ম্মাবরণ দিয়া দেন নাই; তাঁহার এই বিধান ছিল যে, যদি তুমি আত্মরক্ষা করিতে চাও ত একটু নিরালার মধ্যে বাস করিয়ো।

চিত্তও সেই নিরালা বাসস্থানটুকুর জন্য সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। কিন্তু পিতামহ অদৃষ্ট পরিহাস করিয়াই হোক্ অথবা ভুল বুঝিয়াই হোক, আমাকে একটি বিপুল জনসমাজের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া এক্ষণে মুখে কাপড় দিয়া হাস্য করিতেছেন, আমি তাঁহার সেই হাস্যে যোগ দিবার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না।

পলায়ন করাও আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় না। সৈন্যদলের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা স্বভাবতই যুদ্ধের অপেক্ষা শান্তির মধ্যেই অধিকতর স্ফূর্ত্তি পাইতে পারিত কিন্তু যখন সে নিজের এবং পরের ভ্রমক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন হঠাৎ দল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করা তাহাকে শোভা পায় না। অদৃষ্ট সুবিবেচনা পূর্ব্বক প্রাণীগণকে যথাযোগ্য কর্ম্মে নিয়োগ করেন না, কিন্তু তথাপি নিযুক্ত কার্য্য দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করা মানুষের কর্ত্তব্য।

তোমরা আবশ্যক বোধ করিলে আমার নিকট আসিয়া থাক, এবং সম্মান দেখাইতেও ত্রুটি কর না। আবশ্যক অতীত হইয়া গেলে সেবকাধমের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কিছু আত্মগৌরব অনুভব করিবারও চেষ্টা করিয়া থাক। পৃথিবীতে সাধারণতঃ ইহাই স্বাভাবিক এবং এই কারণেই "সাধারণ" নামক একটি অকৃতজ্ঞ অব্যবস্থিতচিত্ত রাজাকে তাহার

অনুচরবর্গ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। কিন্তু অনুগ্রহ নিগ্রহের দিকে তাকাইলে সকল সময় কাজ করা হইয়া উঠে না। নিরপেক্ষ হইয়া কাজ না করিলে কাজের গৌরব আর থাকে না।

অতএব, যদি কিছু শুনিতে ইচ্ছা করিয়া আসিয়া থাক ত কিছু শুনাইব। শ্রান্তি মানিব না এবং উৎসাহেরও প্রত্যাশা করিব না।

আজ কিন্তু অতি ক্ষুদ্র এবং পৃথিবীর অত্যন্ত পুরাতন একটি গল্প মনে পড়িতেছে; মনোহর না হইলেও সংক্ষেপবশতঃ শুনিতে ধৈর্য্যচ্যুতি না হইবার সম্ভাবনা।

পৃথিবীতে একটি মহানদীর তীরে একটি মহারণ্য ছিল। সেই অরণ্যে এবং সেই নদীতীরে একটি কাঠঠোক্‌রা এবং একটি কাদাখোঁচা পক্ষী বাস করিত।

ধরাতলে কীট যখন সুলভ ছিল তখন ক্ষুধা নিবৃত্তিপূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে উভয়ে ধরাধামের যশঃকীর্ত্তন করিয়া পুষ্ট কলেবরে বিচরণ করিত।

কালক্রমে দৈবযোগে পৃথিবীতে কীট দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল।

তখন নদীতীরস্থ কাদাখোঁচা শাখাসীন কাঠঠোক্‌রাকে কহিল, "ভাই কাঠঠোক্‌রা, বাহির হইতে অনেকের নিকট এই পৃথিবী নবীন শ্যামল সুন্দর বলিয়া মনে হয় কিন্তু আমি বলিতেছি ইহা আদ্যোপান্ত জীর্ণ।"

শাখাসীন কাঠঠোক্‌রা নদীতটস্থ কাদাখোঁচাকে কহিল, "ভাই কাদাখোঁচা, অনেকে এই অরণ্যকে সতেজ শোভন

বলিয়া বিশ্বাস করে কিন্তু আমি বলিতেছি ইহা একেবারে অন্তঃসারবিহীন।”—

তখন উভয়ে মিলিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কাদাখোঁচা নদীতীরে লম্ফ দিয়া পৃথিবীর কোমল কর্দ্দমে অনবরতই চঞ্চু বিদ্ধ করিয়া বসুন্ধরার জীর্ণতা নির্দ্দেশ করিতে লাগিল এবং কাঠঠোক্‌রা বনস্পতির কঠিন শাখায় বারম্বার চঞ্চু আঘাত করিয়া অরণ্যের অন্তঃশূন্যতা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বিধিবিড়ম্বনায় উক্ত দুই অধ্যবসায়ী পক্ষী সঙ্গীতবিদ্যায় বঞ্চিত। অতএব কোকিল যখন ধরাতলে নব নব বসন্ত সমাগম পঞ্চমস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল, এবং শ্যামা যখন অরণ্যে নব নব প্রভাতোদয় কীর্ত্তন করিতে নিযুক্ত রহিল, তখন এই দুই ক্ষুধিত অসন্তুষ্ট মূক পক্ষী অশ্রান্ত উৎসাহে আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে লাগিল।

এ গল্প তোমাদের ভাল লাগিল না? ভাল লাগিবার কথা নহে। কিন্তু ইহার সর্ব্বাপেক্ষা মহৎগুণ এই যে, পাঁচ সাত পারাগ্রাফেই সম্পূর্ণ।

এ গল্পটা যে পুরাতন তাহাও তোমাদের মনে হইতেছে না? তাহার কারণ পৃথিবীর ভাগ্যদোষে এ গল্প অতি পুরাতন হইয়াও চিরকাল নূতন রহিয়া গেল। বহুদিন হইতেই অকৃতজ্ঞ কাঠঠোক্‌রা পৃথিবীর দৃঢ় কঠিন অমর মহত্ত্বের উপর ঠক্‌ঠক্‌ শব্দে চঞ্চুপাত করিতেছে এবং কাদাখোঁচা পৃথিবীর সরস

উর্ব্বর কোমলত্বের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ শব্দে চঞ্চু বিদ্ধ করিতেছে আজও তাহার শেষ হইল না, মনের আক্ষেপ এখনও রহিয়া গেল।

গল্পটার মধ্যে সুখদুঃখের কথা কি আছে জিজ্ঞাসা করিতেছ? ইহার মধ্যে দুঃখের কথাও আছে সুখের কথাও আছে। দুঃখের কথা এই যে, পৃথিবী যতই উদার এবং অরণ্য যতই মহৎ হউক্‌ ক্ষুদ্র চঞ্চু আপনার উপযুক্ত খাদ্য না পাইবামাত্র তাহাদিগকে আঘাত করিয়া আসিতেছে। এবং সুখের বিষয় এই যে, তথাপি শত সহস্র বৎসর পৃথিবী নবীন এবং অরণ্য শ্যামল রহিয়াছে। যদি কেহ মরে ত সে ঐ দুটি বিদ্বেষবিষজর্জ্জর হতভাগ্য বিহঙ্গ, এবং জগতে কেহ সে সংবাদ জানিতেও পায় না।

তোমরা এ গল্পের মধ্যে মাথামুণ্ডু অর্থ কি আছে কিছু বুঝিতে পার নাই? তাৎপর্য্য বিশেষ কিছুই জটিল নহে, হয় ত কিঞ্চিৎ বয়স প্রাপ্ত হইলেই বুঝিতে পারিবে।

যাহাই হউক্‌ সর্ব্বসুদ্ধ জিনিষটি তোমাদের উপযুক্ত হয় নাই? তাহার ত কোন সন্দেহমাত্র নাই।

সমাপ্ত।